দাম : সাত টাকা

# স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা।। ৩০ জুলাই - ২০১২।। ১৪ শ্রাবণ - ১৪১৯

## রাষ্ট্রবোধের উন্মোচনে রাখীবন্ধন

'সংস্কৃতই পারে
জ্ঞান প্রযুক্তির যুগে
ভারতবর্ষকে সর্বোত্তম
শক্তিতে পরিণত করতে'

— চ. মূ. কৃষ্ণশাস্ত্রী

# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

কমিউনিস্টরা বিদেশী তত্ত্বকে স্বদেশী বলে প্রচার করে বিভ্রান্ত করেছে জনগণকে □ ৯

কৌশলের রাজনীতি চলছে রাজ্যে □ ১০

খোলা চিঠি : আমে-দুধে মিশে গেল কারাট গড়াগড়ি খেল □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

রাখী পূর্ণিমার দিনে রাষ্ট্রবোধের অনুধ্যানে □ ডঃ স্বরূপ ঘোষ □ ১২

একান্ত সাক্ষাৎকারে চ. মূ. কৃষ্ণশাস্ত্রী : 'সংস্কৃতই পারে জ্ঞান প্রযুক্তির যুগে ভারতবর্ষকে সর্বোত্তম শক্তিতে পরিণত করতে' □ ১৪

পুরাণ কথায় রাখী-বন্ধন □ স্বামী প্রবরানন্দ গিরি □ ২১

একলা চল রে— কেবলই সঙ্গীত? □ ইন্দিরা রায় □ ২৬

দিল্লীতে সিপিএমের এ কে গোপালন ভবনে 'বিপ্লব' □ ২৭

গান্ধী-নেহরু-যোগেন-জ্যোতি-সুরাবর্দী আর মমতা হিন্দুর ক্ষতিসাধনে কার বেশি ক্ষমতা? □ শিবাজী গুপ্ত □ ২৮

মাওবাদীরা দেশের জঘন্যতম শত্রু □ এম ভি কামাথ □ ৩০

সোনিয়ার কৃপায় কেরল সরকারকেই গ্রাস করে ফেলেছে মুসলিম লিগ □ ৩২

স্মরণে : আচার্য ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী; এক মহাজীবনকথা □ গোপাল চক্রবর্তী □ ৩৬

ইতিহাসের আলোকে প্রাচীন অলিম্পিক □ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৮

সক্রেটিস ও প্লেটোর মতো দার্শনিকরাও অলিম্পিক দেখতে আসতেন □ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অন্যরকম : ৩৪ □ শব্দরূপ: ৪০ □ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২



সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা, ১৪ শ্রাবণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ৩০ জুলাই - ২০১২

দাম : ৭ টাকা


প্রচ্ছদ নিবন্ধ

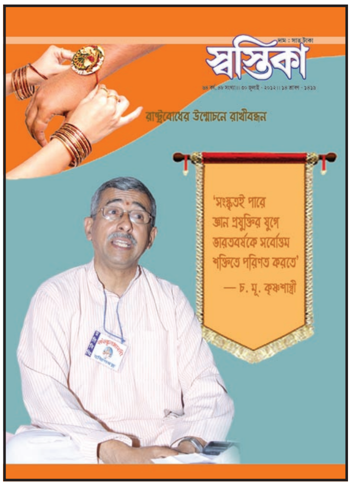


একান্ত সাক্ষাৎকার চ. মূ. কৃষ্ণশাস্ত্রী
পৃঃ ১৪-১৮


স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

**Postal Registration No.-**
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

# স্বস্তিকা

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

### বিশেষ বিষয় : কাশ্মীরের মধ্যস্থতাকারীদের মুখে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ভাষা

কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার কাশ্মীরের সমস্যা সমাধানে দিলীপ পাডগাঁওকরের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি মধ্যস্থতাকারী দল গঠন করেছিল। কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন সংস্থা ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা কিছু সুপারিশ করেছেন। সম্প্রতি সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। সেই সুপারিশে বিচ্ছিন্নতাবাদী তথা সন্ত্রাসবাদীদের মুখের ভাষাই প্রকাশ পেয়েছে। সেটা নিয়েই স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয়।

লিখেছেন — মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ) ও বাসুদেব পাল।

*দাম একই থাকছে — সাত টাকা।*

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ

আর মরুদ্যান নয়, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা মরুভূমিই গ্রাস করিয়াছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরমের বক্তব্যের প্রতিবাদ হইতে পারে, সিপিএম দলের অভিযোগকে নিছক নাটক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নয়, বিরোধীদল সিপিএমও নয়, এমনকী রাজভবনও নয়। রাজ্য সরকারের নিজস্ব তথ্যই প্রকাশ্যে আনিয়াছে অপরাধ বৃদ্ধির ছবিটিকে। বাম শাসনের শেষ বছরে এবং ২০১০ সালের সঙ্গে নতুন সরকারের প্রথম বছর ২০১১ সালের তুলনামূলক যে তথ্য তুলিয়া ধরা হইয়াছে সেইখানে প্রত্যক্ষ হইতেছে ২০১১ সালে সামগ্রিক ভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে অপরাধের সংখ্যা। ডাকাতি চুরি এবং খুনের ঘটনা বেশি না হইলেও মহিলাদের উপর নির্যাতন এবং অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্টেট ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য উল্লেখ করিয়া যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছে রাজ্যের স্ট্যাটিসটিক্স এবং প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেনটেশন দপ্তর তাহাতেই উল্লেখিত হইয়াছে এই তথ্য।

২০১০ সালে রাজ্যে খুন হইয়াছিল ২ হাজার ৩৯৮টি, যাহা ২০১১ সালে হইয়াছে ২ হাজার ১০৯টি। ডাকাতির ঘটনা ২০১০-তে ২৮৮টি এবং ২০১১ সালে ২৩৬টি। চুরির ঘটনা ২০১০ সালে হইয়াছিল ৭৯৮টি, ২০১১ সালে হইয়াছে ৭৬০টি। দাঙ্গাজনিত সংঘর্ষের ঘটনা ২০১০ সালে ঘটিয়াছিল ৬ হাজার ৮০৯টি এবং ২০১১ সালে ঘটিয়াছে ৬ হাজার ১৯টি। শ্লীলতাহানির ঘটনা ২০১০ সালে যেইখানে ঘটিয়াছিল ২ হাজার ৪৬৫টি, সেইখানে ২০১১ সালে ঘটিয়াছে ২ হাজার ৩৬৩টি। তবে খুনের সংখ্যা কমিলেও বৃদ্ধি পাইয়াছে হত্যার চেষ্টার ঘটনা। ২০১০ সালে ওই সংখ্যাটি ছিল ২ হাজার ১১১ তাহা ২০১১ সালে বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ২ হাজার ২৪২টি। বৃদ্ধি পাইয়াছে ধর্ষণের ঘটনাও। ২০১০ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৩১১টি এবং ২০১১-তে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ২ হাজার ৩৬৩টি। বাম শাসনের শেষ বছরে মহিলা অপহরণের ঘটনার সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৭৬৪টি। নতুন সরকারের প্রথম বছরে ওই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ৩ হাজার ৭১১টি। পরিসংখ্যানে দেখা যাইতেছে বৃদ্ধি পাইয়াছে ইভটিজিং, পণের কারণে হত্যার ঘটনা। স্বামী বা আত্মীয়দের হাতে মহিলানিগ্রহ ঘটিয়াছে ২০১০ সালে ১৭ হাজার ৭৯৬টি, ২০১১ সালে ১৯ হাজার ৭৭২টি। অবশ্য ২০১১ সালের প্রথম কয়েক মাসের অপরাধের দায়ভাগ রহিয়াছে বামফ্রন্টেরও। তবু দেখা যাইতেছে মহিলা নির্যাতনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে কোনও পরিবর্তন হয় নাই। শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হইলেও এই বিষয়ে কোনও পরিবর্তন এখনও দেখা যায় নাই। পণ আদায়ের ক্ষেত্রে পুরুষ হইতে মহিলাদের ভূমিকা বেশিমাত্রায় থাকে। এ বিষয়ে সচেতনতার প্রয়োজন।

বাম আমল হইতে আজ পর্যন্ত একটা বিষয় দেখা যাইতেছে মহিলা নির্যাতনের ক্ষেত্রে মহিলাদেরই প্রধান ভূমিকা রহিয়াছে। বাম আমলে গ্রামগঞ্জে বিরোধীদলের বাড়ীর মেয়ে-বৌদের চরম লাঞ্ছনা ও অত্যাচারে নেতৃত্ব দিয়াছিল তৎকালীন শাসকদলের মহিলাবাহিনী। আজ হুগলী, পূর্ব-মেদিনীপুরেও একই ঘটনা চলিতেছে, কেবল ঝাণ্ডা বদল ঘটিয়াছে। মহিলাদের উপর শাসন শোষণ বন্ধ হয় নাই। অথচ সরকার পরিবর্তনের কালে মানুষ সুশাসনেরই স্বপ্ন দেখিয়াছিল। অপ্রিয় হইলেও সত্য সেই সুশাসনের লক্ষণ এখনও পর্যন্ত দেখা যায় নাই। সরকার অবশ্য বলিতেছে সব ঠিকভাবেই চলিতেছে। বামফ্রন্টও একই কথা বলিয়াছিল, যাহা শান্তির মরুদ্যান নামে উল্লেখিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও শান্তির মরুদ্যানের কথা বলিতেছেন। কিন্তু হায়, বামফ্রন্ট আমলে যেমন সেই মরুদ্যানকে খুঁজিতে হইত, এখনও তাহাই হইতেছে। অপরাধের ঘটনার নিরিখে ২০১০-ও যাহা ২০১১-ও তাহা। একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নাই।

## জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

*বেদান্তের অর্থ বেদের শেষভাগ, উহা বেদের তৃতীয় অংশ। উহার নাম উপনিষদ্। প্রাচীন ভাগে যে-সকল ভাব বীজাকারে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বীজগুলিই উহাতে সুপরিণত হইয়াছে। বেদের অতি প্রাচীন ভাগের নাম সংহিতা। উহা অতি প্রাচীন ধরনের সংস্কৃত ভাষায় রচিত। যাস্কের নিরুক্ত নামক অতি প্রাচীন অভিধানের সাহায্যেই কেবল উহা বুঝা যাইতে পারে।”*

*—স্বামী বিবেকানন্দ।*

# মধ্যপ্রদেশে নগর সমিতির নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার

**নিজস্ব প্রতিনিধি** ॥ দিল্লী ও উত্তরপ্রদেশের পর মধ্যপ্রদেশের সাম্প্রতিক বিভিন্ন নগর সমিতির নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি দারুণ ভালো ফল করেছে। রাজ্যের পনেরোটি জেলার ৪১টি সমিতির নির্বাচনে ৩৬টি দখল করেছে বিজেপি। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। তার আগে এই বিরাট জয় বিজেপি'র পক্ষে উৎসাহের বিষয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, যেসব এলাকা কংগ্রেসীদের গড় বলে কথিত, সেখানে অনেক জায়গাতেই বিজেপি প্রার্থীরা কংগ্রেসীদেরকে কুপোকাৎ করেছেন। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি কান্তিলাল ভুরিয়ার জেলা ঝাবুয়া এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কমলনাথের কেন্দ্র ছিন্দওয়াড়াতেও কংগ্রেস হেরে ভূত। বড়বানীতে বিগত ৫৫ বছরে এই প্রথম বিজেপি প্রার্থীর সভাপতি পদে জয়লাভ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই ফলাফল থেকে পরিষ্কার যে, রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি কান্তিলাল ভুরিয়ার (স্বয়ং জনজাতি সমাজভুক্ত) জনজাতি কার্ড অথবা বিজেপির নেতাদের উপর অযৌক্তিক অপপ্রচার— কোনওটাই কাজে আসেনি।

দুই দফার এই নির্বাচনে প্রথম দফার ২৯টি আসনের মধ্যে বিজেপি ২০টি দখল করেছে। কংগ্রেসকে মাত্র তিনটি আসন জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। চারটি আসনে নির্দল প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে। দ্বিতীয় দফায় ২২টি নগরপালিকা এবং নগর পরিষদে নির্বাচন হয়। বিজেপি ১৫টিতে, পাঁচটিতে কংগ্রেস এবং দুটি ক্ষেত্রে নির্দল প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে। বিগত নির্বাচনে বিজেপি ২৫ এবং কংগ্রেস ১১টি আসনে জিতেছিল। এবার নতুন ৭টি নিগম হয়েছে— সেখানে প্রথমবার নির্বাচন হলো।

কংগ্রেসীদের গড় বলে কথিত— রাজ্য সভাপতি কান্তিলাল ভুরিয়ার সংসদীয় ক্ষেত্র রতলাম-ঝাবুয়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কমলনাথের লোকসভা কেন্দ্র ছিন্দওয়াড়া, রাজেন্দ্র সিং রাজুখেড়ীর কেন্দ্র ধার, অরুণ যাদবের কেন্দ্র বড়বানী (খণ্ডবা জেলা), বসৌরি সিং মেশ্রাম-এর কেন্দ্র মণ্ডলা-ডিণ্ডোরি এবং রাজেশ নন্দিনী সিং-এর কেন্দ্র অনুপপুর-এ কংগ্রেস প্রার্থীরা হেরে গিয়েছে। ভুরিয়া রাজ্য সভাপতি হওয়ার পরে মহেশ্বর এবং জুবেরা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও কংগ্রেস জনজাতি কার্ড খেলেও সুবিধা করতে পারেনি।

দলের নিদারুণ পরাজয়ে কংগ্রেসের ঘরোয়া কোন্দল শুরু হয়ে গেছে। কান্তিলাল ভুরিয়ার বিরোধী গোষ্ঠীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সভাপতির নিজের সংসদীয় কেন্দ্রে রতলাম এবং ঝাবুয়াতেও চূড়ান্ত পরাজয়ের ফলে কংগ্রেস শিবিরে দিশাহীন হতাশ অবস্থা। ভুরিয়া বিরোধীরা দলের রাজ্যশাখার ভারপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক বি কে হরিপ্রসাদ-এর কাছে দরবার করে কড়া ব্যবস্থার দাবী জানিয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি প্রভাত ঝা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, গ্রামীণ জনগণ দলের প্রতি এই ফলাফলের মাধ্যমে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। এজন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, রাজ্যের মহেশ্বর বিধানসভার উপনির্বাচনেও বিজেপি প্রার্থী জয়লাভ করেছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এই জয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্যের জনজাতিবহুল এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হলো। মানুষ দলের আদর্শবাদ এবং কর্মীদের প্রতি ভরসা করেছে। সরকারের দায়িত্ব বেড়ে গেল। এবং সরকার তাদের আবশ্যকতা পূরণে কোনওরকম গাফিলতি করবে না। রাজ্য সরকার আরও বেশি করে জনকল্যাণকারী প্রকল্প রূপায়ণ করবে। বনবাসী- জনজাতিদের উন্নয়নে সরকারের সাফল্যই নির্বাচনে সাফল্য এনে দিয়েছে বলে শ্রী চৌহান জানিয়েছেন।

**মধ্যপ্রদেশের স্থানীয় নির্বাচনের ফলাফল (এক নজরে)**

| জেলার নাম | চেয়ারম্যান | বিজেপি | কংগ্রেস | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|
| রতলাম | ১ | — | — | ১ |
| বেতুল | ৩ | ২ | ১ | — |
| ঝাবুয়া | ৪ | ৩ | ১ | — |
| অলিরাজপুর | ৩ | ২ | ১ | — |
| ধার | ৮ | ৬ | ২ | — |
| বড়বানী | ৭ | ৬ | ১ | — |
| বুরহানপুর | ১ | ১ | — | — |
| ছিন্দওয়াড়া | ৬ | ৪ | ২ | — |
| সিবনী | ১ | — | — | ১ |
| মণ্ডলা | ৫ | ৪ | — | ১ |
| ডিন্ডোরি | ২ | ২ | — | — |
| বালাঘাট | ১ | ১ | — | — |
| শহদোল | ৪ | ৩ | — | — |
| অনুপপুর | ২ | ২ | — | — |
| উমরিয়া | ১ | — | — | ১ |
| | ৪১ | ৩৬ | ৮ | ৫ |

সংবাদ প্রতিবেদন

# ভারতীয় বিমানবাহিনীর গোপন পরিকল্পনা তথ্য ফাঁস

**নিজস্ব প্রতিনিধি**॥ ভারতীয় বিমান-বাহিনীর যাবতীয় গোপন খবরাখবর এবং আগামীদিনে বিমানবাহিনী কোন পথে চলবে তার অতি উচ্চ গোপনীয় পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আসায় রাজনৈতিক মহলে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা এর সঙ্গে জড়িত আছেন বলে অনুমান। বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান চীফ এয়ার মার্শাল (অবঃ) এস. কৃষ্ণস্বামী পুরো ঘটনাটিকে ‘সাংঘাতিক’ বলে বর্ণনা করেছেন।

বর্তমানে জেলে থাকা অস্ত্র ব্যবসায়ী এবং বিমান বাহিনীর প্রাক্তন ব্যবসা-সহযোগী অভিষেক ভার্মা সম্প্রতি বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কাছে যে তথ্য পাঠিয়েছেন তা প্রকাশ্যে আসার পর কপালে চোখ উঠে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলের। তথ্যের মধ্যে রয়েছে বিমান বাহিনীর শতাধিক পদ্ধতির নাম, তার পরিমাণ এবং অবশ্যই এর মূল্যও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকী অস্ত্রভাণ্ডার পরিবহনের জন্য ইউ এ ভি (আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকলস) সম্পর্কেও রয়েছে গোপনীয় তথ্য। সেইসঙ্গে আছে চীনের নিকটবর্তী এয়ার ফিল্ডের পরিকাঠামো এবং নতুন গুপ্তচর স্যাটেলাইটের অচেনা তথ্য। এই তথ্য ফাঁস যে দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আগামীদিনে মাথাব্যথার কারণ হতে যাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

কড়া নিরাপত্তার মধ্যে কম্পিউটার সিস্টেমের সেন্ট্রাল ডেটাবেসের মধ্যে রাখা একশ’ লাইনেরও বেশি তথ্যগুলি যেভাবে ফাঁস হয়েছে তাতে বিমান বাহিনীর অস্তিত্বের সংকটও ঘনীভূত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। ইংরেজি দৈনিক দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের হাতে বিমান বাহিনীর তথ্য ফাঁসের খবর প্রথম আসে। ফাঁস হওয়া তথ্যগুলো যাচাই করে বিমান বাহিনীর প্রাক্তন এমনকী বর্তমান আধিকারিকেরাও এগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

এয়ার চীফ মার্শাল (অব:) কৃষ্ণস্বামীর বক্তব্য, “এর দায় পুরো বিমান-বাহিনীকেই নিতে হবে। বিমান বাহিনীর প্রত্যেকটি দপ্তরই এর পেছনে রয়েছে। ২০২০-র মধ্যে বিমানবাহিনীর যেসব পরিকল্পনা ছিল, ফাঁস হওয়া তথ্য একঝলক দেখলেই তা বোঝা যাবে। এর ফলে প্রতিপক্ষরা আমাদের অবস্থা এবং বিমানবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে যাবে।” প্রসঙ্গত, এই তথ্যে ডিরেক্টোরেট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির লোগো ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে ওই পদে রয়েছেন সুব্রত পার্ক। ২০১০ সালে অক্টোবর মাসে বিমানবাহিনীর ই-মেল আই ডি-ও ফাঁস হয়ে যায়। এছাড়াও ২০১১-১২ বর্ষের ভারতীয় বিমানবাহিনীর ‘অ্যাকুইজিশন প্ল্যান’ যেটা প্রায় বিশ পাতার এবং হাতের লেখায় ছিল তাও আর গোপনীয় নেই।

বর্তমানে বিমান-বাহিনীর কর্তারা ব্যস্ত রয়েছেন তথ্য ফাঁসের পেছনে কারা রয়েছে তা খুঁজে বার করতে। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অধিকাংশ শক্তিশালী মিডিয়া-ই যেভাবে ‘খবর’টিকে ব্ল্যাকআউট করেছে তাতে এর পেছনে ‘রাঘব-বোয়াল’দের জড়িত থাকার সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আর সেক্ষেত্রে গত তিন বছরে ইউ পি এ-দুই সরকারের আমলে যেভাবে একর পর এক আর্থিক দুর্নীতি ধামাচাপা পড়েছে, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবে বলে মনে করছেন না তথ্যাভিজ্ঞ মহল। সুতরাং এই অপূরণীয় ক্ষতি কিসের বিনিময় দেশবাসী সামাল দেন আগামী বেশ কয়েকবছর সেদিকেই শঙ্কিত দৃষ্টি থাকবে আমাদের।

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

# করসেবার দায়ে ডেপুটি অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেলকে আইনী নোটিশ পাক-সরকারের

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন সে দেশের সহকারী অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেলকে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার দায়ে কারণ দর্শানোর চিঠি (শো-কজ নোটিস) ধরাল। সংবাদে প্রকাশ, সহকারী অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল মহম্মদ খুরশিদ খানের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন

*খুরশিদের করসেবা।*

ধর্মস্থানগুলিতে দর্শনার্থীদের জুতো পরিষ্কার করার মতো তাঁর দেশের পক্ষে মানহানিকর কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মর্মে অভিযুক্ত জনাব খানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি গুরুদ্বার ও ভারতের মন্দিরগুলির ভক্তজনের পাদুকা পরিষ্কার করার মতো কাজে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হওয়ার অভিযোগ পত্রপাঠ নস্যাৎ করে দেন। ক্ষুব্ধ খান জানান, তিনি নোটিসের কপি এখনও না পেলেও সরকারের এই বিলম্বিত প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত বিস্মিত। কেননা তিনি স্বেচ্ছায় এই সেবাকাজ দীর্ঘ ৩ বছর ধরে করে আসছেন।


*ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র*

**প্রণব**

পড়ুন ও পড়ান


তাঁর দুর্নাম করতে সরকারের এই দুরভিসন্ধিপূর্ণ কাজকে তিনি রাজনৈতিক চক্রান্ত বলেই মনে করছেন।

বিস্ফোরক এক উদ্ধৃতি দিয়ে খান জানান, পাকিস্তানের ফেডারেল মন্ত্রী পেশাওয়ারের একটি নাগরিক উদ্যান জবরদখল করে সেখানে হোটেল খোলার পরিকল্পনা নেওয়ায় পেশোয়ার হাইকোর্টে একটি মামলা রুজু হয়। খুরশিদ খান এই কুকর্মে তাঁকে সহযোগিতা না করায় প্রতিহিংসামূলক আচরণ হিসেবেই তাঁকে আক্রমণ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কিছুদিন আগেই ওই মন্ত্রীর পুত্র তাঁকে খুন করার হুমকিও দিয়েছেন।

সংবাদে প্রকাশ গত মার্চ মাসেই দিল্লীর গুরুদ্বার রাকাবগঞ্জ ও শীসগঞ্জে মহম্মদ খানকে করসেবারত অবস্থায় দেখা গেছে। এ ছাড়া তিনি রাজধানীর বিড়লা ও হনুমান মন্দিরের মতো অন্যান্য ধর্মস্থানেও সেবা কার্য চালিয়েছেন।

খান সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর সরকারি অত্যাচারের ক্ষত মেরামত করার জন্য তিনি এই প্রতীকি সেবা ২০১০ সাল থেকেই চালু রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে ক্ষোভ ব্যক্ত করে খান জানান, ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারীতে তালিবানরা পেশোয়ারে ৩ জন শিখকে অপহরণ করে।

২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার মুক্তিপণ দাবী করার পর তারা ২ জনকে মুক্তি দিলেও তালিবানরা তৃতীয় জয়পাল সিং-এর মাথা কেটে দেয়। তখন পাকিস্তান ছিল নীরব। পাকিস্তান সরকারের এই চক্রান্তকে ধিক্কার জানিয়ে খান বলেন, ২৬ নভেম্বর মুম্বাই হামলায় জড়িত ঘৃণ্য পাকিস্তানী অপরাধী আজমল কাসবের গ্রেপ্তার দেশের পক্ষে কলঙ্কজনক না পুণ্যস্থানগুলিতে সেবা কাজ করা দেশের পক্ষে অমর্যাদাকর— তা ভাবার সময় এসেছে।

# বাংলাদেশীদের হামলায় অশান্ত কোকরাঝাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কোকড়াঝাড়ে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ঠেকাতে সেনা নামানো হয়েছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক হিংসার বলি কুড়ি জনের বেশি মানুষ। পত্র-পত্রিকাতে যতই লুকোছাপা করে জাতিদাঙ্গা বা গোষ্ঠীদাঙ্গা বলে চালানো হোক না কেন, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দাঙ্গা বা মারামারিটা চলছে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী মুসলমানদের সঙ্গে কোকরাঝাড়ের হিন্দু 'বড়ো' জনজাতিদের। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বহু মানুষ প্রাণবাঁচাতে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। অসম সরকার দাঙ্গা দমনে সেনাবাহিনীকে দেখামাত্র গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারকে কোকরাঝাড়ে পাঠানো হয়েছে।

প্রকৃত ঘটনা হলো দাঙ্গার কারণ জমি দখল। বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা (ঘটা করে অভিবাসী বলা হচ্ছে) বোড়ো জনজাতিদের এলাকায় জমি-জায়গা দখল করে এলাকার জনগোষ্ঠীগত ভারসাম্যকে বদলে দিচ্ছে। এর ফলে বোড়োরা আতঙ্কিত। জমি বেহাত হলে পেটে টানপড়াটা স্বাভাবিক। যদিও কোকরাঝাড়ে বি টি এ বা 'বোড়ো টেরিটোরিয়াল এরিয়া' স্থানীয় প্রশাসন দেখভাল করে। জনজাতিদের জমি-জায়গা-সম্পত্তি রক্ষায় খাতায় কলমে আইন থাকলেও বাস্তবে তা কতটা দেখা হয় সেটা সন্দেহের বিষয়।

যাই হোক, যে কোনও প্রকারে শান্তি ও পারস্পরিক বিশ্বাস ফিরে আসুক। কিন্তু ভোটলিপ্সু রাজনীতি অসমের অনুপ্রবেশ ও বিদেশী বিতাড়নে সবচেয়ে বড় বাধা। এই বাধা দূর না হলে কোকরাঝাড়ের ঘটনা অসম জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এরকম খবরও এসেছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে। অনেক দেরীতে। বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করতে না পারলে স্থায়ী শান্তি সুদূরপরাহত।

# কমিউনিস্টরা বিদেশী তত্ত্বকে স্বদেশী বলে প্রচার করে বিভ্রান্ত করেছে জনগণকে

একেই বলে আম আর দুধ মিশে যায়। আঁটি গড়াগড়ি খায়। মার্কসবাদী মহাপণ্ডিত প্রকাশ কারাত সম্প্রতি দলীয় মুখপত্র গণশক্তি দৈনিকেব প্রথম পাতায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে পার্টির নিচুতলার কমরেডদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে তৃণমূলের জোট থেকে বিছিন্ন করতেই তাঁরা প্রণববাবুকে রাষ্ট্রপতিপদে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারাত সাহেব অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে বাম বিরোধী ভোটের বিভাজনই সিপিএমকে আবার ক্ষমতায় ফেরাবে। পরে দেখা গেল কারাত সাহেবের অঙ্ক মেলেনি। নিজে ডুবেছেন। পার্টিকেও ডুবিয়েছেন। দলের তরুণ তুর্কিরা নানা অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলছেন। রাষ্ট্রপতিপদে কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন করার নীতিটি কারাতকে বুঝিয়েছিলেন পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু। আবার বিমানবাবুকে 'ডিভাইড এন্ড রুল' এই বৃটিশ কৌশলটি গিলিয়ে ছিলেন পার্টির 'আঁতেল রত্ন' বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। পার্টি অফিসে বসে আঁতেল তত্ত্ব আওড়ানো এক কথা এবং বাস্তবতাকে মেনে রাজনীতি করাটা ভিন্ন কথা। জ্যোতি বসু থেকে বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা কোনও দিনই মাঠে ময়দানে লড়াই করে রাজনীতিতে আসেননি। এঁরা সকলেই চেয়ারে বসে চা সিগারেট ওড়ানো গলাবাজি করা তাত্ত্বিক নেতা। বই পড়া কম্যুনিস্ট। তাই আম আর দুধের মিশে যাওয়ার কথাটাই তাঁরা জানেন না। কারণ, ল্যাটিন আমেরিকার যে সব তাত্ত্বিক কম্যুনিস্ট নেতাদের প্রবন্ধ পড়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মশাই মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী হয়েছিলেন সেই নেতাদের দুধে আম কাঁঠালের রস মিশে যাওয়ার খাঁটি ভারতীয় রেসিপিটি জানা ছিল না। আজও জানা নেই। কারাত, বিমান, বুদ্ধদের দোষও দেওয়া যায় না। ভারতের কম্যুনিস্টরা সকলেই বিদেশ থেকে আমদানি করা রাজনৈতিক তত্ত্বকে 'স্বদেশী' বলে প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। পঞ্চাশ থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ছাত্রদের স্টাইলই ছিল এক মুখ দাড়ি, আকাচা পাজামা-পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলা নিয়ে আঁতেল কম্যুনিস্ট হওয়া। এতে নাকি সহজেই সহপাঠিনীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যেত। এইসব আঁতেল কম্যুনিস্টরা কোনওদিনই ভাবেনি যে পশ্চিমবঙ্গে তারা ক্ষমতার চেয়ারে বসবে। ১৯৭৭ সালে প্রফুল্ল সেনের রাজনৈতিক ভুলে এবং বিকল্পের অভাবে বামপন্থীরা মহাকরণ দখল করেছিল। কংগ্রেসের ভৈরব বাহিনীর অত্যাচারের অবসান ঘটাতেই

**গূঢ়পুরুষের**

**কলম**

বাংলার মানুষ বড় বড় বুলি কপচানো কম্যুনিস্টদের ভোট দিয়েছিল। ডুবন্ত মানুষ যেভাবে খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা করে। তারপর গত ৩৫ বছর বামপন্থীরা মহাকরণে দখল কায়েম রেখেছিল কারণ, বিকল্প ছিল না। কারাত সাহেবের ভোট বিভাজন তত্ত্ব আমি বিশ্বাস করি না। যেমন বিশ্বাস করি না, রাজ্যের মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক ঠিক করে দেয় পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় কারা থাকবে। মুসলিম ভোট যদি এতটাই শক্তিশালী হোত তবে এই রাজ্যে মুসলিম লিগের মতো ইসলামি রাজনৈতিক দল বিগত তিন চার দশকের মধ্যে ক্ষমতার কাছাকাছি চলে আসতো। প্রতিবেশি রাজ্য অসমে এমনটা হয়েছে। বাংলায় হয়নি। তবুও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস, বামপন্থী সিপিএম, তৃণমূল সকলেই মুসলিম তোষণ নীতি চালিয়ে যাচ্ছে এই আশায় যে মুসলিমরা যদি এককাট্টা হয়ে ভোট দেয় তবে বহু আসনে জেতাটা সহজ হবে। ঠিক এই কারণেই মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ বিধানসভার আসনেই বিজেপি ছাড়া অন্য সব দলই মুসলিম প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়। ধরে নেওয়া হয়, মুসলমান ভোটদাতারা অ-মুসলিম বা হিন্দু প্রার্থীকে ভোট দেবে না। এই রাজনৈতিক তত্ত্বের সত্যতা নিয়ে তর্ক না জুড়ে একটা কথা তো বলা যায় যে তিন চারটি জেলায় মুসলিম ভোটদাতারা নির্বাচনে একটা 'ফ্যাকটার' হলেও বাদবাকি জেলাতে নয়। কমপক্ষে ১৪টি জেলায় হিন্দু ভোটদাতারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরাই রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। মুসলিম ভোটদাতারা নয়। তবু মমতার অহেতুক মুসলিম তোষণ দেখে দুঃখ হয়। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান না থেকেও তৃণমূল নেত্রী কলকাতায় দলীয় সমাবেশে বলেন, '২১ জুলাই তৃণমূলের শহীদ স্মরণ দিবস থেকে পবিত্র রমজান মাসের শুরু। তাই দলের সব হিন্দু কর্মী সমর্থকরা কমপক্ষে একটি খেজুর নিয়ে মুসলমান ভাইদের রোজা ভাঙার সময় উপস্থিত থাকবেন।' মমতা এখন তাঁর প্রতিটি ভাষণের শেষে নিয়ম করে 'ইনসা আল্লা' কথাটি বলেন। একাধিকবার তিনি আল্লার দোয়া মাঙেন। ভাল কথা। পশ্চিমবঙ্গের ৭০-৭২ শতাংশ ভোটদাতা আজও বিপদে আপদে, সুখে আনন্দে ভগবানকেই স্মরণ করেন। শঙ্খ বাজিয়ে আরাধ্য দেবতাকেই বরণ করেন। তাই আল্লার দোয়া চাওয়ার সঙ্গে যদি তিনি একবারের জন্যও ভগবানের বা ঈশ্বরের আশীর্বাদও চাইতেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ করা যেত না। হায়! মমতা কলকাতার ধর্মতলায় শহীদ স্মরণ সমাবেশে একাধিকবার আল্লার দোয়া চাইলেও একবারের জন্য ভগবানের আশীর্বাদ চাননি। রমজানের উপবাসের কথা উল্লেখ করলেও একবারও শ্রাবণী পূর্ণিমা বা ঝুলনযাত্রারম্ভের কথা বলেননি। মমতা হয়তো ভুলে গেছেন, একইরকম তোষণ নীতি বুদ্ধদেববাবুরাও অনুসরণ করেছিলেন। লাভ হয়নি। মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক বামপন্থী শাসকদের রক্ষা করতে পারেনি।

মমতাও সিপিএমের ছেঁড়া চটিতে পা গলিয়ে একই তোষণ নীতি অনুসরণ করছেন। আগামী দিনে এর পরিণাম ভয়ংকর হবে সেকথা এখনই বলে দেওয়া যায়।

রাজ্য রাজনীতি

# কৌশলের রাজনীতি চলছে রাজ্যে

**নিশাকর সোম**

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদানের লাইনে নিজেকে 'গরীব চাষির বেটা' বলে ঘোষণাকারী সিপিএমের বিদ্রোহী (?) বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লাকে ভোট দিতে দেখা গল। এই লাইনে তৃণমূল, কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক ও সিপিএম বিধায়কদেরও দেখা গেল। এ শুধু ভোটের একই লাইন নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও একই লাইন। বিজেপি-এর ভয়ে ভীত হয়ে দিশেহারা সিপিএম। সিপিএম অবশ্য একাধিকবার লোকসভায় নরসিমা সরকারের পতন রোধ করবার জন্য ওয়াক আউটের কৌশল নিয়েছিল। সিপিএম আদপেই কংগ্রেস বিরোধী কি? কেবলমাত্র জরুরি অবস্থা থেকে নিজেদের মাথা উঁচু করার জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণের ছত্রছায়াতে লোকসভা নির্বাচনে লড়েছিল। তদানীন্তন জনতা পার্টির সঙ্গে ঐক্য গড়ে লোকসভায় জিতে বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট গড়ে রাজত্ব কায়েম করেছিল।

ভি পি সিং

জ্যোতি বসু

এই কৌশলের অঙ্গ হিসাবে ময়দানে অটলবিহারী বাজপেয়ী আদবানির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে জ্যোতি বসু ভোটের কথা (১৯৮৯) বলেছিলেন। এটা ছিল সিপিএমের দিল্লীতে গুরুত্ব বাড়ানোর কৌশল। সিপিআই জরুরি অবস্থা সমর্থন করেছিল, কেননা রাশিয়া-চীন ইন্দিরাকে সমর্থন করেছিল। তদানীন্তন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক পি সুন্দরাইয়া আর এস এস-কে নিষিদ্ধ করাকে সমর্থন করেছিলেন। আবার পরবর্তীকালে মোরারজি মন্ত্রিসভার পতনের ব্যাপারে সিপিএম অন্য কৌশল নেয়। মোরারজিকে সরিয়ে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-কে নিয়ে সিপিএম নাচানাচি করে। আর একটু পেছনে যাই। ১৯৬৯ সালে সিপিএম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী নীলম সঞ্জীব রেড্ডির বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর প্রার্থী ভি ভি গিরিকে সমর্থন করে যাতে কংগ্রেসের ভাঙন হয়। গিরির জয়কে সিপিএমের কেন্দ্রীয় ইংরাজি মুখপত্রে, পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক পি. রামমূর্তি 'জনতার জয়' বলে অভিহিত করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের ব্যাঙ্ক-বীমা রাষ্ট্রীয়করণের ব্যবস্থাকে কমিউনিস্টরা (সিপিএম সমেত) দু'হাত তুলে সমর্থন করেছিলেন। কমিউনিস্টরা চিরদিনই কংগ্রেসের কোলে মানুষ হয়েছে। স্বাধীনতাপূর্বকালেও কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের কোলে আশ্রয় পেয়েছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর রাজনৈতিক সচিব হিসাবে কাজ করেছিলেন তদানীন্তন কমিউনিস্ট ডঃ জেড এ আহমেদ। কমিউনিস্ট নেতা সাজ্জাদ জাহির— যিনি পাকিস্তান জেলে আটক ছিলেন, তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা জওহরলাল নেহরু করেন। কারণ সাজ্জাদ জাহির জওহরলালের 'বান্নেভাই' বলে পরিচিত ছিলেন। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে জনসাধারণ ক্রোধ প্রকাশ করলে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী গান্ধীর দয়াভিক্ষা চেয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তেলেঙ্গানার জমি আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এমনকী আন্দোলনের জন্য অস্ত্রশস্ত্র নেহরুর পায়ে পর্যন্ত সমর্পণ করেছিলেন। পার্টি ভাঙার পর সিপিআই তো কংগ্রেসের বিশ্বস্ত সহচর ছিল। বস্তুত কমিউনিস্টরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' পন্থা অনুসরণে দ্বিধা করেনি। আবার ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের বিরুদ্ধে মানুষের ক্রোধের শিকার হয় কমিউনিস্টরা। তখন স্টেনগান নীতির প্রবর্তক তদানীন্তন রাজ্য পার্টির (সিপিআই) সম্পাদক ভবানী সেন ভু-দান-এর নেতা আচার্য বিনোবা ভাবের পদছায়া ভিক্ষা করেছিলেন— স্টেনগান টু ভু-দান। ধন্য কমিউনিস্টদের কৌশল। তাই প্রয়াত সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত কমিনিস্টদের 'কৌশল পার্টি' বলেছিলেন।

ফরওয়ার্ড ব্লক তো ১৯৭১ সালে কংগ্রেসের হাত ধরেছিল। তাঁদের দলের নেতা শীলভদ্র মাজী কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের দলের সাংসদ বিনয়কৃষ্ণ দাশ চৌধুরীও কংগ্রেসে গিয়েছিলেন। কোচবিহারের কমল গুহও কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন— একথা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ভক্তিভূষণ মণ্ডল আমাকে বলেছিলেন।

আর এস পি-এস ইউ সি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বয়কটের একই নীতি নিয়েছে। এস ইউ সি তো আর এস পি ভেঙে তৈরি হয়েছিল শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে। আর এস পি-র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন চ্যাটার্জি কংগ্রেস দলে যোগাদান করেন এবং রাজ্যসভার সদস্য হন। এবং এস ইউ সি মমতার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তৃণমূলের দয়াতে লোকসভাতে একজন সদস্য করতে সক্ষম হয়েছে। তৃণমূল-এর রাজনীতি আর কংগ্রেসের নীতি কি ভিন্ন? আবার মজা দেখুন, সিপিআই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদানে বিরত থেকে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইউপিএ প্রার্থীকে ভোট দেবে।

# আমে-দুধে মিশে গেল, কারাট গড়াগড়ি খেল

**মাননীয় শ্রীপ্রকাশ কারাট**
**সি পি এম সাধারণ সম্পাদক,**
**এ কে গোপালন ভবন, নয়াদিল্লী,**

কমরেড কারাট,

প্রথমেই মাপ চাইছি শিরোনামের জন্য। বিশ্বাস করুন ওটা আমার বক্তব্য নয়। আপনাদের লাল কর্মী, সমর্থকরাই এমনটাই বলছে। আপনার কী দোষ বলুন তো? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামক রাজনীতিকটি যে কে আগাম অনুমান করাই যায় না। একেবারে শেয়ার বাজারের মতো। ঝুঁকি নিতেই হয়। লাগলে তাক না লাগলে তুক। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রতিবারই না লাগার তুকটুকু নিয়েই আপনাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। 'ইস্, এবারও হলো না' টাইপের হা-হুতাশ করতে হয়।

কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে বিভাজন তৈরি করতে প্রণব মুখোপাধ্যায়কে সমর্থন করার 'কৌশল' নিয়েছিলেন। ঠিকই করেছিলেন। কিন্তু একেবারে শেষ বেলায় মূল আর তৃণমূল একেবারে আমে-দুধে মিশে গেল। কিন্তু কী করবেন বলুন তো! মমতা যে দুঃখজনক সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলবেন তা কে জানত?

সত্যি কমরেড, আপনাদের জন্য দুঃখ লাগছে। একেবারে প্রথম থেকে দেখুন। সেই কবে থেকে মমতা বনাম কংগ্রেস লড়াই চলছে রাইসিনা হিলসের পরবর্তী বাসিন্দা ঠিক করতে। প্রথমে মমতা তিন প্রার্থীর নাম বললেন। প্রধানমন্ত্রীর ওপর যে তাঁর ভরসা নেই সেটা বোঝাতে মনমোহন সিংয়ের নামও প্রস্তাব করে দিলেন। সনিয়া গান্ধী ওদিকে ছক করে রেখেছেন, অর্থমন্ত্রীকেই এবার বৃদ্ধাবাসে পাঠাবেন। নামও প্রস্তাব করে দিলেন। মমতার হঠাৎ-বন্ধু মুলায়ম সিং ডিগবাজি মারলেন। ক্ষুব্ধ, স্তব্ধ মমতা সেদিন মহাকরণ ছাড়ার আগে হুমকি দিয়ে দিলেন 'গেম ইজ নট ওভার'।

সবাই ভাবছে করেনটা কী করেনটা কী? মমতা শুরু করলেন 'ফেসবুক আন্দোলন'। ভারতীয় রাজনীতিতে নয়া সংযোজন। তারপর এ পি জে আব্দুল কালামের 'না' চিঠি। মমতার 'ধন্যবাদ' চিঠি। পি এ সাংমার মহাকরণ সফর। প্রণবের মমতাকে পাত্তা না দিয়ে সিপিএমের সঙ্গে সখ্যতা। আবার প্রণবের 'প্রিয় মমতা' চিঠি। নাটকের পর নাটক। একটু একটু করে রাষ্ট্রপতি ভোটের দিন এগিয়ে আসছে আর কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের দূরত্ব বাড়ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের সঙ্গে মমতার সংঘাত। প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে 'মন্তব্য' যুদ্ধ। সবই কমরেড কারাট আপনাদের ফেভারে ছিল।

কিন্তু এরই মাঝে কীসব যেন হয়ে গেল। মমতা যদিও বলছেন কোনও রকম লেনদেন হয়নি। যদিও দিল্লীর রাজনৈতিক মহল তা বিশ্বাস করছে না। সে যাই হোক জোটের স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'দুঃখিত' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। আর আপনাদের পথে বসালেন। শ্যামও রইল না কুলও রইল না।

কমরেড, আপনাদের অবাধ্য ছেলে রেজ্জাক মোল্লাকে এটাকে 'গ্রহের ফের' বলেছেন। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেসকে এক সারিতে দেখে আমারও মনে হয়েছে, এ এক চরম বিস্ময়। কিন্তু কমরেড, ভারতীয় সংবিধান মতে দেশের সাধারণ মানুষ জন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। আর সেই হিসেবে যার আপনাদের ভোট দিয়েছেন আর যার কং-তৃণমূল জোটকে দিয়েছেন তারা সবাই একই চেয়েছেন। সত্য, গণতন্ত্র এ এক চরম পরিহাস!

কমরেড, আপনাদের সঙ্গে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মাখোমাখো সম্পর্কটা চিরকালের। কিন্তু বলিহারি যাই দিদিমণিকে। তিনি কিনা সিপিএম সমর্থিত প্রার্থীকে ভোট দিলেন? এটা আপনারাও ভাবেননি। বরং অঙ্ক কষেছিলেন, প্রণবকে তৃণমূল সমর্থন না করলে মমতার ইউপিএ ত্যাগ অবশ্যম্ভাবী হবে। আপনার অঙ্ক না মিললেও ফর্মুলায় গোলমাল ছিল। অথচ দেখুন কত ক্ষতি স্বীকার করতে হল আপনাদের। বামফ্রন্টে 'নীতি' ভাঙন হলো। দলের নেতা প্রসেনজিৎ বসুকে তাড়াতে হলো। এমনকি প্রতিবাদের ঝড় এমন ছিল যে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শাখা এস এফ আইয়ের ইউনিট ভেঙে দিতে হলো। বাম শরিকরা এখন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে প্রশ্ন তুলছে, 'নীতির থেকে কৌশল বড় হলো?' কেউ কেউ বলছেন, 'প্রণবকে সমর্থন করে উদারনীতির বিরুদ্ধে বাম আন্দোলন আঘাত খেল।'

মূল আর তৃণমূলের ফাঁক খুঁজে ঢুকে পড়ার এই প্রস্তাবটা গিয়েছিল বাংলা ব্রিগেড থেকেই। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসুদের দাবি মানতেই আপনাকে ওই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখুন দলের ভিতরে বাইরে গাল শুনতে হচ্ছে আপনাকেই। বাংলার একটা বড় অংশের নেতারা তো বটেই এমনকি আপনার নিজের রাজ্য কেরলেও 'সিদ্ধান্ত' নিয়ে ক্ষোভ জমেছে।

ঘাবড়াবেন না কমরেড। রাস্তা আছে। আমার কথা শুনলে আপনার মুখ বাঁচবে। আপনি বরং বোঝান তৃণমূলের লাইনে সিপিএম হাঁটেনি, পরিস্থিতি গোলমেলে হয়ে যাওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসই আপনাদের লাইনে হেঁটেছে। আমার সশ্রদ্ধ লাল সেলাম জানবেন।

**—সুন্দর মৌলিক**

# রাখী পূর্ণিমার দিনে রাষ্ট্রবোধের অনুধ্যানে

ডঃ স্বরূপ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে— তাহা পলিটিক্স হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসা হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে। সমাজের কোনও বিশেষ অংশে তাহাকে প্রাচীরবদ্ধ করিয়া মানুষের আরাম-আমোদ হইতে, কাব্য-কলা হইতে, জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা রক্ষার জন্য সর্বদা পাহারা দাঁড়াইয়া নাই। ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমগুলি এই ধর্মকেই জীবনের মধ্যে, সংসারের মধ্যে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনের জন্য নহে। সমগ্র সংসারই ধর্ম-সাধনের জন্য।"

রাখী বন্ধন ভারতবর্ষের শাশ্বত সাধনার এই ভাবকে দৈবিক প্রেম যোগের মাধ্যমে এক আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধতে শেখায়। বেদান্ত দর্শনের ভাবই রাখী বন্ধনের মূলে যা সমগ্র রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সহায়ক হতে পারে। সেখানে অন্যের দুঃখে নিজের সুখ নয়, অন্যের দুরবস্থায় নির্লিপ্ত হয়ে নিজের সম্পদের বিকাশ নয়, এই অন্য যে আমার পর নয় বেদান্ত বোধ সেই একাত্মবাদকে জ্ঞানের অন্বেষণের দ্বারা যোগের সাধনায় ও প্রেমের আরাধনার মধ্য দিয়ে আনন্দময়কে উপলব্ধি করে, আত্মাকে বিকশিত করে, এক অনির্বচনীয় স্তরে উন্নীত হয়ে একের মধ্যে বহুকে ও নিজের মধ্যে বিশ্বাত্মাকে অনুভব করা যায়। ভারতের রাষ্ট্রবাদের কেন্দ্রে আছে এই বেদান্তবোধ। পশ্চিমী ধাঁচের রাষ্ট্রবাদের চর্চা স্বাধীনতা উত্তরকালে রাখী বন্ধনের সনাতন সভ্যতা থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পুণ্যভূমিতে দুর্বৃত্ত আশ্রয় নিয়েছে। তাঁরা ইতিহাসকে অর্থশক্তির বলে বিকৃত করছে। অস্বীকার করতে চাইছে ধর্মকে। ভারতবর্ষের এই সংকটকালে সনাতন ধর্মের উৎসবগুলি বারংবার আমাদের নিজেকে নিজের ভিতর খুঁজে পাবার কথা মনে করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায় ভারতবর্ষ রয়েছে মহাভারতের ধর্মপথে। সে পথ ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম, ধনী বণিকশ্রেণী, পশ্চিমমুখী বুদ্ধিজীবী, মধ্যপন্থী রাজনৈতিক শক্তি বামপন্থীদের সহায়তায় ভারতবর্ষকে নিরীশ্বরবাদের পথে নিয়ে যেতে উদ্ধত ফণা তুলেছে। দুর্নীতি গ্রাস করেছে দেশকে। স্বাধীনতা সংগ্রামে এক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নেমেছিল ভারতবাসী। সে আদর্শের ভিত্তিভূমি ছিল বৈদিক দর্শন ও সনাতন ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সেই মহান আদর্শের দীক্ষাগুরু। শ্রী অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও আরও পূর্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এঁরা সকলেই তাঁদের ভারতবর্ষীয় সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজের প্রতি তাঁদের ছিল অসীম শ্রদ্ধা ও জীবনে নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই আদর্শবাদী সর্বত্যাগী আন্দোলনের হাত ধরে যে স্বাধীনতা এলো এ উপমহাদেশে, সন্ধির স্বাধীনতা ওই ত্যাগের সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করল।

যে ধনিক শ্রেণী ও পশ্চিমের ভাবে বিশ্বাসী মিডিয়ার হাতে ভারতবর্ষ এসে পড়ল, সনাতন ভারতবাসীর বিশ্বাস নেই সেই 'ইন্ডিয়ান'দের প্রতি ভবিষ্যত ভারতকে যাঁরা বিভ্রান্ত করল। স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাস ছিল প্রভুর ভক্তদের প্রতি, ভারতবর্ষের সাধনায় আস্থাশীল ভারতবাসীর প্রতি। তিনি বলেছিলেন, "আমরা ধনী বা বড়লোক গ্রাহ্য করি না। আমরা হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কসার ব্যক্তিদের ও তাদের নিস্তেজ সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলিও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি, জয় প্রভু, জয় প্রভু, তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা।" সে প্রভু কে? শ্রীরামকৃষ্ণদেব। শ্রীরামকৃষ্ণ কে? শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের যুগ্ম অবতার। তাই রাখীপূর্ণিমার দিনে রাষ্ট্রবোধের অভিষেকমন্ত্র কোথায়? রামায়ণ ও মহাভারতে। সাহেবরা ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড তাঁদের আদর্শে বিশ্বাসী ও ভারতবর্ষের সনাতন কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি অনীহাযুক্ত 'Anglicized Indians'-দের হাতে দিয়ে গেলেন। দুর্নীতিগ্রস্ত ভারতবর্ষের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন এই মধ্যপন্থী নিরীশ্বরবাদী ভোগবাদে বিশ্বাসী পশ্চিমের গুণমুগ্ধ শাসককুল যাঁরা স্বাধীনতার পর

সিংহভাগ সময় দেশের শাসনদণ্ড নিজেদের হাতে রেখেছেন বিভিন্ন উপায়ে। উপরতলার দুর্নীতির ছায়া এসে পড়েছে একেবারে নীচতলা পর্যন্ত। দরিদ্রবাড়ী থেকে রাজনীতিতে উঠে আসা অনেক নেতাকে দেখা গেছে অতি শীঘ্র ধূমকেতুর মতো রাতারাতি সহস্র কোটি টাকার মালিক হয়ে উঠতে। দেশবাসী দেখেছে কিছু ক্ষমতাবান রাজনীতিবিদ, কয়েকজন চিত্র পরিচালক ও নায়ক-নায়িকা, কিছু ক্রিকেট খেলোয়াড়, হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠা শিল্পপতি, বেশকিছু আমলা কিভাবে স্বাধীনতা উত্তরকালে সহস্র কোটি টাকার মালিক হয়ে উঠেছে। এঁরা নীতিহীনভাবে নিজেদের সীমাহীন লোভের লালসায় সমস্ত ব্যবস্থাটাকেই প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন করে দিয়েছে।

দেশসেবা তা রাজনীতির মাধ্যমেই হোক বা সরকারি, বেসরকারি চাকরি বা ব্যবসার মধ্যে দিয়েই হোক তা করার জন্য মানসিকতা তৈরি হওয়ার প্রয়োজন ছিল। শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় কি? যেমন সন্ন্যাসী হতে গেলে দীর্ঘ বছর ধরে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থেকে চিন্তন, মননের সংস্কারান্তে আত্মসংযম ও শুদ্ধাচারের মাধ্যমে সাধনার উচ্চ উপলব্ধির স্তরে উত্তরণের পরই সন্ন্যাস গ্রহণ করা যায়। তাই আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের মতো অন্যান্য সন্ন্যাসী সঙ্ঘেও কাজকর্মের মধ্যে সেবার শুদ্ধভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখেছি। তেমনই দেশসেবায় নিযুক্ত হবার পূর্বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল। আমাদের দেশে রাজ-সন্ন্যাসীর দর্শন আছে। রাজাকে সন্ন্যাসীর মতো হবার শিক্ষা দেওয়া হয় এবং প্রকৃত রাজা সেই, যে ভোগ নয় ত্যাগের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছে। গান্ধীজী নিজে সরল জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে সেই আদর্শের দিকে নির্দেশ করেছিলেন। সর্বস্ব ত্যাগের মধ্যে দিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র দেখিয়ে গিয়েছিলেন তিনি স্বামীজীর ভাব শিষ্য, দেশকে এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশানের মন্ত্রে বাঁধতে গিয়ে প্রাণের আহুতি দিয়েছিলেন স্বামীজীর ভাব অনুরাগী শ্যামাপ্রসাদ। স্বাধীনতার পর কিছু রাজনৈতিক নেতার হঠাৎ বিপুল ধনসম্পদের মালিক হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে রাষ্ট্রবোধের দীক্ষা নিয়ে বা দেশসেবার আকুতি নিয়ে তাঁরা রাজনীতিতে আসেননি। এসেছেন আত্মস্বার্থ সিদ্ধি হেতু।

তাই বর্তমান নেতাদের মুখে বড় বড় কথা শুনলে মানুষ হাসাহাসি করেন ঘরে বসে। যাঁরা বলছেন তাঁরা দেশপ্রেমিক কি? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "দেশপ্রেমিক হতে গেলে যে জাতি অতীতকালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ করেছে, সেই জাতিকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসো। ...হে আমার ভাবী সংস্কারকগণ, ভাবী দেশপ্রেমিকগণ! তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও, তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছ—কোটি কোটি লোক অনাহারে মরছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরে অর্ধাশনে কাটাচ্ছে। তোমরা কি মনে প্রাণে বুঝছ—অজ্ঞতার কালো মেঘ ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে? তোমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে? এই চিন্তা কি তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করে তুলেছে? ...দেশপ্রেমিক হবার এই হলো প্রথম সোপান।" আমাদের বর্তমান নেতা-নেত্রীদের কেউ-ই কি এই প্রথম সোপানটিই উত্তীর্ণ হবেন? দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা ৬৪ বছরেও যাঁরা করে উঠতে পারেনি আর বিপুল কালো টাকা দেশে বিদেশে ক্ষমতাবানদের সমৃদ্ধিকে প্রশ্ন করছে তখন শ্রদ্ধা তাঁরা আশাও করেন কিভাবে? সংবিধান তাঁদের কাছে বই মাত্র। বোধের জগতের সোপান নয়। ছলে বলে কৌশলে সংবিধানের অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রায় অস্বীকার না করলে ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীতে একটি চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে পরিণত হোত না। স্বাধীনতার ৬৪ বছর পর যাঁরা আজ ৫০ কোটির বেশি টাকার মালিক তাঁরা সৎ পথে ধনবান হয়েছেন দেশবাসী সে কথা বিশ্বাস করে কি? এখনও বিভিন্ন অছিলায় লোকপাল বিলকে ঠাণ্ডা ঘরে রেখে দেওয়ার মধ্যেই মানসিক দীনতা স্বপ্রকাশিত। পদের গুরুত্ব বিচার করে ত্যাগের সাধনার সঙ্গে তাকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা ছিল স্বাধীনতা উত্তরকালে। শুধু পুঁথিগত শিক্ষাই সব নয়। তাঁর জীবনযাপনের রীতিনীতিটিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দেশসেবক প্রাসাদোপম অট্টালিকায়, বিদেশী গাড়ী নিয়ে ধনপতির জীবনযাত্রায় অবস্থা যখন সাধারণ দরিদ্র মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। এঁরা দেশসেবক? এঁরা রাষ্ট্রবোধে দীক্ষিত? এঁদের কথা শুনতে হবে? এঁরা শ্রদ্ধেয়? স্বার্থান্ধ লোভী মানুষজন ধনবলের সাহায্যে প্রচারের কুহকে গণতন্ত্রে জেতা-হারাকে হাস্যকর করে দিয়েছে। আজ দেশ নেতৃত্বহীনতায় ভুগছে। কারণ নেতা হতে গেলে যে ত্যাগের দীক্ষা প্রয়োজন তা দেখা যাচ্ছে অধিকাংশেরই নেই। সর্বত্রই মানুষটি অতি ছোট মনের নিম্ন মানের। আসনটি তাঁর থেকে অনেক মহান। ফলে আজ কেউই আসনের যোগ্য হয়ে উঠতে পারছে না। এতেই প্রমাণিত বর্তমান নিয়োগ পদ্ধতির অন্তঃসারশূন্য দশা।

বড় পদে বসার পূর্বে বা সেবামূলক পদে চাকরি শুরু করার আগে নীতিশাস্ত্রের পাঠ প্রয়োজন এবং তিন বছরকাল আশ্রমিক জীবনে সাধনার মাধ্যমে সেই পুঁথিগত বিদ্যার তত্ত্ব আত্মস্থ করার আবশ্যিকতা রয়েছে। তাছাড়া শরীরচর্চার শিক্ষাতে সামরিক বাহিনীকে যুক্ত করে দেশের যুব সমাজকে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে দীক্ষার প্রয়োজন। রাষ্ট্রবোধের দীক্ষা, বৈদিক দর্শনের শিক্ষা, রাখীপূর্ণিমার একাত্মবাদে শক্তিলাভ করুক। শিবমন্ত্রে জেগে উঠুক নবভারতের যুবশক্তি। ▯


**বইয়ের এজেন্ট চাই**

নবম-দশম-একাদশ-দ্বাদশ ও ডিগ্রি কোর্সের বই বিক্রয়ের জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্লক ভিত্তিক এজেন্সি দিতে চাই।

সম্পূর্ণ পোষ্টাল ঠিকানা দিয়ে এস.এম.এস করুন ৯৮৩২০৪৩৫১৫ নম্বরে ।

বই - এস.রায় সম্পাদিত "লেটার মার্ক A+"

## একান্ত সাক্ষাৎকারে চ. মূ. কৃষ্ণশাস্ত্রী

# ‘সংস্কৃতই পারে জ্ঞান-প্রযুক্তির যুগে ভারতবর্ষকে সর্বোত্তম শক্তিতে পরিণত করতে’

*সম্প্রতি সংস্কৃত ভারতী পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত বিশাল সংস্কৃত সম্মেলন ও দু’দিনের যুব-কার্যকর্তা শিবিরে এসেছিলেন সংস্কৃত ভারতীর অখিল ভারতীয় প্রকাশন প্রমুখ চ. মূ. কৃষ্ণশাস্ত্রী। সংস্কৃতে কথোপকথনের নবদিগন্ত উন্মোচন করেছেন এই মানুষটিই। সময় অল্প। তাই চূড়ান্ত ব্যস্ততা সত্ত্বেও স্বস্তিকা’র টেপরেকর্ডারের জন্য সময় রেখেছিলেন অনেকটাই। টেপরেকর্ডার হাতে তাঁর কাছে স্বস্তিকার প্রতিনিধি অর্ণব নাগ।*

■ **কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং গৌহাটি থেকে গুজরাট এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমিতে বর্তমানে সংস্কৃত চর্চার চালচিত্রটা ঠিক কিরকম?**

■ এটা বিভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতের ওপর নির্ভর করে। তিনটি স্তরে মূলতঃ সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথমত, স্কুল স্তরে। দ্বিতীয়ত, স্কুল পরবর্তী উচ্চশিক্ষার স্তরে এবং তৃতীয়ত, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সংস্কৃত পাঠশালা, টোল ইত্যাদি সংস্কৃত-শিক্ষার চিরাচরিত পীঠস্থানে —এই শিক্ষা আমরা পেয়ে থাকি। স্কুলস্তরে পন্ডিচেরী, তামিলনাড়ু, নাগাল্যান্ড এই রাজ্যগুলিতে সংস্কৃত শিক্ষার কোনও সুযোগ নেই। এদের বাদ দিলে বাকি রাজ্যগুলিতে স্কুলশিক্ষায় বিভিন্ন স্তরে সংস্কৃত ‘ঐচ্ছিক ভাষা’ হিসেবে রয়েছে। কোনও কোনও রাজ্যে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে, কোথাও বা সপ্তম শ্রেণী থেকে, কোথাও আবার অষ্টম শ্রেণী থেকে সংস্কৃত শিক্ষালাভের সুযোগ ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে থাকছে। কোথাও চল্লিশ, কোথাও পঞ্চাশ, কোথাও আবার একশ’ নম্বরের প্রশ্নপত্রের সম্মুখীন হতে হয় এই ভাষার ছাত্র-ছাত্রীদের। এটা রাজ্য অনুযায়ী নির্ভর করে। দেশে চৌদ্দটা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সাতটি সংস্কৃত অ্যাকাডেমি, আটটি সংস্কৃত বোর্ড, পাঁচ হাজার চিরাচরিত পাঠশালা, ছোট-বড় মিলিয়ে হাজারখানেক বেদ পাঠশালা, একশ’রও বেশি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সংস্কৃত ভাষা ও শিক্ষার প্রসার এবার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। খুব দুর্ভাগ্যজনক হলো, বেশ কয়েকটি রাজ্যে শাস্ত্রচর্চা এবং বেদ শিক্ষা, সেইসঙ্গে দর্শনচর্চা যেমন ন্যায়দর্শন ইত্যাদির হাল অত্যন্ত শোচনীয়। হাজার খোঁজ করলেও একজনও শাস্ত্রজ্ঞ কিংবা বৈদিক পণ্ডিত খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুব সংক্ষেপে সারা দেশে সংস্কৃতচর্চার চালচিত্রটা ঠিক এমনই।

■ **সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে যেটাকে মূল প্রতিবন্ধকতা**

**হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে তা হলো ভাষাটির জটিলতা। যেমন লম্বা বাক্য, কঠিন উচ্চারণ— সব মিলিয়ে একে শক্ত ভাষা বলা যেতে পারে। অনেকে মনে করেন, ভারতের সংস্কৃতিচর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখতে সংস্কৃত ভাষাকে অনেক সহজ- সরল করা দরকার। আপনার কি বক্তব্য?**

 দেখুন বিষয়টাকে দু'দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা দরকার। প্রথমত, অতীতের ব্যাপার-স্যাপারগুলো আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। দ্বিতীয়ত, বর্তমান বাস্তবতাটাকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কী, ভাষাটা কঠিন নয়। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রতিটি ভাষাই একইভাবে সহজ আবার সমভাবে কঠিন। আসলে শিক্ষণ পদ্ধতিটাই এই ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য যে শিক্ষণ-প্রণালী কার্যকর রয়েছে তা বিদেশী পদ্ধতি। এর নাম ব্যাকরণ অনুসারী পদ্ধতি। এটা দু' হাজার তিনশো বছরের পুরোনো ইউরোপীয় শিক্ষণ প্রণালী। এটা ভারতে এসেছে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য। এদেশে মেকলে আসার আগে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা হোত সংস্কৃতেরই মাধ্যমে। কিন্তু মেকলীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলনের পর এখানে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা হতে থাকল এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য ভাষার মাধ্যমেও সংস্কৃত চর্চার ধারা দেখা গেল। আসলে বৃটিশরা যখন ভারতবর্ষে এসেছিল তখন সংস্কৃত ভাষা বোঝার জন্য তাদের ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ইংরেজি অনুবাদটা খুব প্রয়োজনীয় ছিল। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য তারা বাধ্য হয়েই 'ব্যাকরণ অনুসারী' পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। সংস্কৃত জটিল হবার এটা একটা বড় কারণ। দ্বিতীয়ত, বৃটিশ যুগে গোড়া থেকে বিশ শতকের প্রারম্ভ অবধি 'ভিক্টোরিয়ান ইংরেজি'ই ছিল তাদের রোল মডেল। সে কারণে প্রত্যেকেই তখন শব্দবহুল ও অলঙ্কারময় ইংরেজি বাক্য ব্যবহার করতো। কিন্তু পরবর্তীকালে বৃটিশ আমলেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। সহজতর ইংরেজি শিক্ষার প্রচলিত হতে দেখা যায়। একইভাবে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির ক্ষেত্রেও দেখা যাবে সেই সমস্ত ভাষাভাষী মানুষজন শব্দবহুল ও অলঙ্কারময় ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে সহজ ও সরল ভাষা প্রয়োগ করতেই বেশি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। যেখানে আমার সংস্কৃত পণ্ডিত ভাইয়েরা সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না। তাই এই ভাষার ক্ষেত্রে শিক্ষণ-প্রণালীর কোনও পরিবর্তন হয়নি, শব্দের অলঙ্কারও হ্রাস পায়নি। সারা বিশ্বেই এখন ব্যাকরণ অনুসারী পদ্ধতি অচল। বিশ্বের প্রথম সারির কোনও ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতির প্রয়োগ আর হয় না। ব্যতিক্রম কেবল সংস্কৃত। সংস্কৃত এখন আমরা শিখি ব্যাকরণের মধ্য দিয়ে, অনুবাদের মধ্যে দিয়ে। এটা ঠিক যে, ব্যাকরণ শিক্ষার বস্তু। কিন্তু প্রশ্ন হলো আপনি ভাষা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ব্যাকরণ শিখবেন নাকি ব্যাকরণের মধ্যে দিয়ে ভাষা শিক্ষা করবেন? আমরা চাই, ভাষা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ব্যাকরণ শিক্ষা হোক। ব্যাকরণের মধ্যে দিয়ে ভাষা শিক্ষা নয়। আমরা কেবল সহজ-সরল সংস্কৃত চালু করার পক্ষপাতী। তবে সেটা পাণিনী'র ব্যাকরণের নিয়মাবলীর মধ্যে থেকেই। বেদের মধ্যেও সহজ-সরল আর আলংকারিক, দু'ধরনের সংস্কৃত শব্দ চয়নেরই দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, 'সত্যম্ বদ', 'মাতৃদেব ভবঃ', 'পিতৃদেব ভবঃ', 'আচার্যদেব ভবঃ', 'ধর্মম্ চরঃ' ইত্যাদি তো সহজ-সরল সংস্কৃতেরই উদাহরণ।

> **এই শতাব্দীতেই গোটা সমাজ ও সারা বিশ্বে পরিবর্তন দেখা দেবে। সমস্ত মহান সৃষ্টি, সমস্ত মহান সংস্কৃতি, সমস্ত মহান আদর্শবাদকে মিলিয়ে সংস্কৃত একাই সমস্ত বিশ্বকে একীভূত করবে, সমস্ত সংঘর্ষরত সভ্যতাকেও মেলাবে সংস্কৃতই।**

**আপনাকে একারণেই এই প্রশ্নটা করেছি কারণ সংস্কৃত সম্ভাষণ (সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন) শিবিরের প্রাণপুরুষ আপনি। যে শিবির সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যেও সংস্কৃত ভাষা কথোপকথনের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। সংস্কৃত নিয়ে উচ্চশিক্ষার ডিগ্রী থাকা স্টুডেন্ট তার সতেরো-আঠারো বছরের শিক্ষার্থী জীবনেও যেখানে সংস্কৃতে একবর্ণও কথোপকথন রপ্ত করতে পারেনি সে যেমন দশদিনের সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির করে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারছে, অন্যদিকে ক্লাস এইটের পর যে কখনও সংস্কৃতের ধারপাশ মাড়ায়নি সেও কিভাবে দশদিনের সম্ভাষণ বর্গের পর দিব্যি সংস্কৃতে কথোপকথন করছে? সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরে ঠিক কিধরনের শিক্ষা-প্রণালী ব্যবহৃত হয় এই দুই বিপরীতমুখী চরিত্রকে মেলাতে?**

 সংস্কৃত সম্ভাষণ বর্গের শিক্ষা-প্রণালী খুব সরল। আমরা সংস্কৃত থেকে সংস্কৃতে শিক্ষা দিই। সংস্কৃতেই পড়ানো হয় দৈনন্দিন কথোপকথন। সংস্কৃতে প্রাত্যহিক কথোপকথনের জন্য এবং সবার মধ্যে সংস্কৃত ছড়িয়ে দিতে এই বর্গ চালু করা হয়েছে। সংস্কৃত ভারতীর কাজ হলো সম্ভাষণ থেকে শাস্ত্রের দিকে, সংস্কৃতে কথোপকথন থেকে ব্যাকরণের দিকে, কথোপকথন থেকে শাস্ত্রের দিকে, সম্ভাষণ থেকে সাহিত্যের দিকে, এককথায় সহজ সংস্কৃত থেকে জটিল সংস্কৃতের দিকে যাত্রা করা।

** এর ফলে সারা দেশ জুড়ে যে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন, সে ব্যাপারে আপনার বিশেষ কোনও উপলব্ধি?**

 সম্ভাষণ বর্গের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা আপনিই উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে এর

চাহিদা এতই বেড়েছে যে সর্বত্র শিক্ষক দিয়ে আমরা কুলিয়ে উঠতে পারছি না। ভারতেই শুধু নয়, বহির্ভারতেও ইদানীং সংস্কৃত সম্ভাষণ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

■ **অনেকেই বলছেন, আপনি হলেন সংস্কৃত জগতের ‘বিগ বস’। নিজে কিছু বলবেন?**

■ (প্রবলভাবে হাত নেড়ে) না না না। কেউ কেউ হয়তো সেরকম ভাবছেন কিংবা বলছেন। কিন্তু আমি খুব দুঃখিত যে ব্যাপারটা আমার পক্ষে হয়তো অমর্যাদাসূচকই হবে। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আমি সংস্কৃতের নিতান্ত এক সেবকমাত্র। আমি সেটাই মনে করি এবং সেভাবেই বাঁচতে চাই। নিজেকে সংস্কৃতের স্রেফ একজন অকিঞ্চন সেবক বলে মনে করি।

■ **তা না হয় হলো। কিন্তু এবিষয়ে আপনার আদর্শ কে? আরও স্পষ্ট করে বললে কাকে দেখে আপনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন?**

■ দেখুন, প্রথমে কিন্তু আমি একজন স্বয়ংসেবক। নিয়মিত সঙ্ঘের শাখায় গিয়েছি। সেখানে প্রার্থনা করেছি। এসবই কিন্তু সংস্কৃততে। সুতরাং প্রথম উদ্বুদ্ধ হয়েছি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখা থেকে। পরবর্তীকালে জরুরি অবস্থার (১৯৭৫-৭৭) সময় যখন জেলে ছিলাম তখন বিবেকানন্দের রচনাবলী, সাভারকরের রচনা পাঠ করি। বিবেকানন্দের রচনায় দেখতে পাই তিনি কীভাবে সংস্কৃত শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সংস্কৃত শিক্ষার জন্য যুবকদের কীভাবে উৎসাহিত করেছেন, এমনকী জীবনের শেষ দিনেও তিনি সংস্কৃত অধ্যাপনা করেছিলেন। সেই কারণেই আমি মনে করি আমাদের দেশের বহু সমস্যার সমাধান একমাত্র সংস্কৃতের মাধ্যমেই হতে পারে। আমার মনে হলো সংস্কৃত জনপ্রিয় হচ্ছে। অথচ আমি সংস্কৃত জানি না। এই মনোভাব থেকেই আমি সংস্কৃত অধ্যয়ন শুরু করি।

■ **সংস্কৃত জনপ্রিয় হবার কথা বারংবার আপনার বক্তব্যে উঠে আসছে। এবং সংস্কৃত ভারতীয় কর্মপ্রয়াস দেখলে আপনার বক্তব্যের সত্যতা নিরূপিত হয়। সংস্কৃত জনপ্রিয় করতে এর নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানটি ঠিক কোন পদ্ধতি অনুসরণ করছে।**

■ সংস্কৃত পুনরুদ্ধার আন্দোলনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত রয়েছে। সংস্কৃতকে জনপ্রিয় ভাষা, কথোপকথন-উপযোগী ভাষা করে তোলা এর প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ হলো সংস্কৃত শিক্ষা প্রণালীর আমূল পরিবর্তন সাধন। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে নীতি পরিবর্তন, শিক্ষক প্রশিক্ষণে পদ্ধতি বদল, পাঠ্যবই পরিবর্তন ইত্যাদি। সমসাময়িক আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টি, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর চর্চা, উন্নয়নের কথা সংস্কৃত সাহিত্যে নিয়ে আসা। আপনি হয়তো জানেন গত দেড়শো বছরে সংস্কৃতে বিভিন্ন ভাষার বই অনূদিত হয়েছে। একইসঙ্গে দেখুন কোনও সংস্কৃত বই অন্য কোনও ভাষায় কিন্তু অনূদিত হয়নি। সংস্কৃত ভারতীই প্রথম অন্য ভাষার বইকে সংস্কৃতে অনুবাদ করতে শুরু করে। এটা আধুনিক শব্দভাণ্ডার সৃষ্টিতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। বিজ্ঞান অর্থনীতি ইত্যাদি আধুনিক বিষয়ের সঙ্গে সংস্কৃতকে যুক্ত করা হয়েছে। সংস্কৃত ও মেথডোলোজি, সংস্কৃত ও বিজ্ঞান, সংস্কৃত ও পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাও শুরু হয়েছে। অনলাইন শিক্ষকতা, দূরশিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা--- আমরা ইতিমধ্যেই ২৮০টি বই প্রকাশ করেছি, এরকম নানাভাবে আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি।

■ **সংস্কৃত ভারতী ছাড়াও আরও অনেক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা সংস্কৃতের প্রচার ও প্রসারে নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছে। তাদের প্রতি আপনার কোনও পরামর্শ রয়েছে?**

■ দেখুন এই সমস্ত সংস্কৃতপ্রেমী ও সংস্কৃতচর্চার সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান হয়তো কোনও না কোনও ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভারতীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। কারণ সংস্কৃত ভারতীর কাজটা এদেরকে নিয়েই। যেমন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠশালা, বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এদের সবাইকে নিয়েই আমাদের কাজ। সেই কারণে কোনও ব্যক্তিবিশেষ এবং সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান, এই বিভাজনে আমরা কাজ করি না। সুতরাং সংস্কৃতপ্রেমী কোনও সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনও পরামর্শ আমার নেই। শুধু এটুকুই বলব, আমরা তাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই। প্রত্যেকটি সংস্কৃতমনস্ক ব্যক্তি, সংগঠনকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করাটাই এখন আমাদের প্রয়োজন।

■ **ইদানীংকালে একটা রব উঠেছে যে সংস্কৃতকে ধর্ম থেকে পৃথক করা প্রয়োজন। বুঝতেই পারছেন কারা এই ধুয়ো তুলছে।**

> “আজকের গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি জনগণের শক্তিই চূড়ান্ত শক্তি। সুতরাং আমরা মানুষের কাছে যাওয়ারই পক্ষপাতী, সরকারের কাছে নয়। সেই কারণে সরকারের সংস্কৃতের প্রতি ঔদাসীন্য আমাদের বিবেচ্য নয়। তবে হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই আমাদের নীতি সরকারের সামনে রাখব। সেই নীতি নিয়ে সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তারেরও চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু ভুললে চলবে না, মানুষই আমাদের মূল লক্ষ্য। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংস্কৃতকে জনপ্রিয় দাবি করে তোলাই, সমাজের মধ্যে, সমাজ থেকে, সমাজের অন্তর থেকে, আমাদের আসল কাজ।”

**আপনি কি বলবেন? খুব স্পষ্ট করে বলি, হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে সংস্কৃতকে যাঁরা প্রতিপন্ন করেন, তাঁদেরকেই বলা হচ্ছে হিন্দুধর্ম থেকে সংস্কৃতকে বিচ্ছিন্ন করার কথা।**

■ প্রথমে বুঝতে হবে, 'হিন্দু' কাকে বলব? আমার কাছে 'হিন্দু' মানে যেটা সমগ্র জগৎকে আচ্ছাদিত করে রয়েছে। যার দর্শন মানুষকে 'একম্ সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'-র মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর মন্ত্রে প্রেরণা দেয়। বিশ্বকে এক পরিবারের ভাবনায় ভাবিত করে। এই প্রেক্ষিত থেকে বলতে পারি, হ্যাঁ, সংস্কৃত হিন্দুদেরই। যাঁরা বিশ্বাস করেন 'একম্ সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি', 'অ নো ভদ্রা, ক্রতবো বিশ্বতঃ' কিংবা 'বসধৈব কুটুম্বকম্'-এর মন্ত্রে, সংস্কৃত তাঁদেরই জন্য। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতে আপনি শংকরের উপাসনা করেন, বিষ্ণুর পুজো করেন, শিবের পুজো করেন। কিংবা কোনও পুজোই যদি নাও করেন তবুও সংস্কৃতকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না কারণ আপনার পদবীটাও সংস্কৃত থেকে এসেছে। এটাই সংস্কৃত। চাণক্য ছিলেন একজন মস্ত বড় সংস্কৃত পণ্ডিত। কিন্তু তিনি নাস্তিক ছিলেন। জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যে খোঁজ করলে বহু সংস্কৃত পণ্ডিতের সন্ধান পাওয়া যাবে। সুতরাং সংস্কৃতে অধিকার সবার।

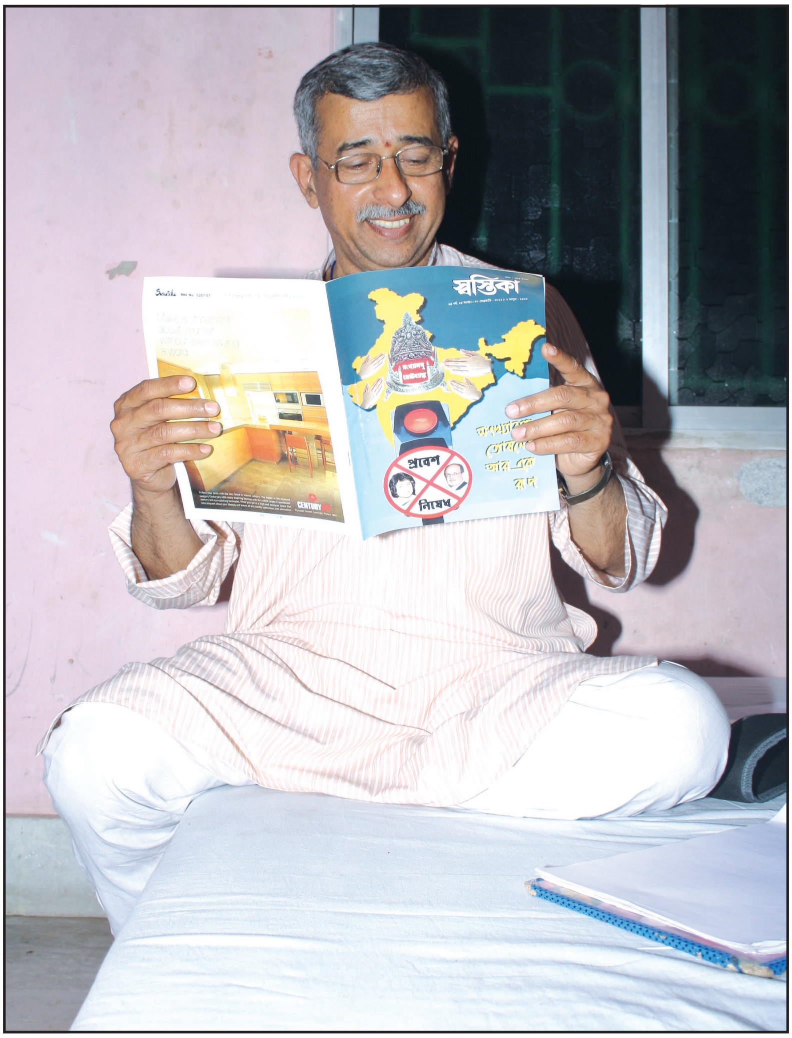


*চোখ স্বস্তিকার পাতায়..*

**■ নতুন প্রজন্ম, যাঁরা সংস্কৃত চর্চায় আগ্রহী তাঁদের প্রতি আপনার কোনও উপদেশ?**

■ এটাকে ঠিক উপদেশ বলব না, স্রেফ আমার অভিজ্ঞতাটুকু তাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব। আমি গত ত্রিশ বছর ধরে সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়িয়েছি। তার থেকে বলতে পারি, ভবিষ্যৎ তাদেরই জন্য অপেক্ষা করছে যাদের কাছে প্রাচীন এবং আধুনিক, উভয় জ্ঞানভাণ্ডারই উন্মুক্ত। ভবিষ্যত তাদেরই রয়েছে, যাদের আয়ত্তে রয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একাধিক জ্ঞানভাণ্ডার। আমার একমাত্র স্বপ্ন, ভারতবর্ষের আজকের যুবসমাজ নেতৃত্ব দিক বিশ্বকে আগামী বিশ-ত্রিশ বছরের জন্য। সংস্কৃত সাহিত্য এবং গীতা, বেদ, বেদান্ত, শাস্ত্র, উপনিষদ ইত্যাদি এঁদের পাথেয়। এগুলোকে ভিত্তি করেই তাঁরা ভারতকে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সামনের সারিতে নিয়ে আসুন। তবেই আমাদের দেশ জগৎগুরুর আসন অলংকৃত করতে পারবে।

**■ আপনি জ্ঞানভাণ্ডারের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার যে মহাসমুদ্রের মতোই অনন্ত এবং মহাশূন্যের মতো অসীম, সেটা আমরা জানি। কিন্তু তাকে কি যুগোপযোগী বলা যাবে?**

■ না বলার তো কোনও কারণ নেই। আজকে আমরা জ্ঞান-শিল্প, জ্ঞান-সভ্যতা, জ্ঞান-অর্থনীতি, এমনকী জ্ঞান-বিশ্বের কথাও বলি। এই সুবিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও রয়েছে। এখনও পর্যন্ত শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি যেখানে সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডারের উন্মুক্ত দিগন্ত রয়েছে, তাকে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রযুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে একে কখনও দেখার চেষ্টা করা হয়নি। যদি আমরা সঠিকভাবে বৈজ্ঞানিক দর্শন থেকে বেদ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারি এবং তার অর্থ যথাযথভাবে উদ্ধার করতে পারি তবে যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের সামনে উন্মোচিত হবে তা ভারতকে বিশ্বের মধ্যে সামনের সারিতে নিয়ে আসবে। আজকের প্রযুক্তিকে তথ্য-প্রযুক্তি বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, আগামীদিনের প্রযুক্তি হলো জৈব-প্রযুক্তি, পরশুর প্রযুক্তি হবে ন্যানোপ্রযুক্তি। এর পর কি? এরপর আসবে জ্ঞান-প্রযুক্তির যুগ। সংস্কৃত বিদ্যাই পারে জ্ঞান-প্রযুক্তির যুগে ভারতকে সর্বোত্তম শক্তিতে পরিণত করতে।

**■ আপনি মনে করছেন সেই অনাগত**

**যুগের প্রস্তুতি শুরু করার সঠিক সময় এখনই?**

□ অবশ্যই। এটাই সেরা সময়। পরিবর্তনের লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। এই শতাব্দীতেই গোটা সমাজ ও সারা বিশ্বে পরিবর্তন দেখা দেবে। সমস্ত মহান সৃষ্টি, সমস্ত মহান সংস্কৃতি, সমস্ত মহান আদর্শবাদকে মিলিয়ে সংস্কৃত একাই সমস্ত বিশ্বকে একীভূত করবে, সমস্ত সংঘর্ষরত সভ্যতাকেও মেলাবে সংস্কৃতই।

**□ সংস্কৃতের জয়যাত্রার কাল হিসেবে আপনি গোটা একবিংশ শতাব্দীটাকেই ধরেছেন। কোনও মহাপুরুষের বাণী বা মন্তব্য উদ্ধৃত করে এরজন্য বিশেষ করে কোনও বর্ষ বা নির্দিষ্ট সময়রেখা যেমন ২০৩০ বা ২০৫০ ইত্যাদি বেঁধে দিতে চাইবেন?**

□ না এরকম কিছু বলতে চাই না। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। এক-দু'বছরে কী এসে যায়!

**□ বিশ্ব-পরিবর্তনের কথা আপনি বললেন। এ রাজ্যেও কিন্তু পরিবর্তন এসেছে। বাম জমানার অবসানে দক্ষিণপন্থী রাজত্বের সূচনা হয়েছে। এহেন সিংহাসন বদলের প্রভাব কি এ রাজ্যের অধিবাসীদের সংস্কৃত-চর্চায় পড়েছে? আমরা জানি, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃত আন্দোলনের সঙ্গে আপনার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সত্যি করে বলুন তো, আগের জমানার প্রতিকূল পরিবেশের কি আদৌ কোনও বদল হয়েছে?**

□ একটা কথা জেনে রাখবেন, রাজনীতিবিদরা সবসময়ই রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হন। তা তিনি বামপন্থী কিংবা দক্ষিণপন্থী যেই হোন না কেন। তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক প্রয়োজন মতোই কাজ করবেন ও সিদ্ধান্ত নেবেন। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা প্রচার ও প্রসারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে আমার মনোভাব এমনই হওয়া উচিৎ যে সংস্কৃতের সমৃদ্ধি নির্ভর করে রাজ্যবাসীর ওপর, রাজ্য সরকারের ওপর নয়। সংস্কৃতের সমৃদ্ধি নির্ভর করে সমাজ-সত্ত্বা ও ধর্মসত্ত্বার ওপর। যে কারণে সংস্কৃতে পণ্ডিতমাত্রই বলতে পারেন, 'ধর্ম দণ্ডীয়সী', 'ধর্ম দণ্ডীয়সী', 'ধর্ম দণ্ডীয়সী'র মতো আপ্তবাক্য। একথা বলার অধিকারী একমাত্র তিনিই। আজকের গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি জনগণের শক্তিই চূড়ান্ত শক্তি। সুতরাং আমরা মানুষের কাছে যাওয়ারই পক্ষপাতী, সরকারের কাছে নয়। সেই কারণে সরকারের সংস্কৃতের প্রতি ঔদাসীন্য আমাদের বিবেচ্য নয়। তবে হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই আমাদের নীতি সরকারের সামনে রাখব। সেই নীতি নিয়ে সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তারেরও চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু ভুললে চলবে না, মানুষই আমাদের মূল লক্ষ্য। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংস্কৃতকে জনপ্রিয় দাবি করে তোলাই, সমাজের মধ্যে, সমাজ থেকে, সমাজের অন্তর থেকে, আমাদের আসল কাজ।

**□ পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য যদি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর তালিকা তৈরি করেন, তবে ঠিক কোন কর্মসূচীগুলি অগ্রাধিকারের তালিকায় প্রথম তিনে থাকবে?**

□ অগ্রাধিকারের তালিকায় প্রথমেই যেটা রাখব, সেটা হলো সংস্কৃতের শিক্ষণ-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধন করা। সেই কারণে আমাদের দরকার সংস্কৃতের শিক্ষক প্রশিক্ষণ। সেইসঙ্গে পাঠ্যপুস্তকেরও পরিবর্তন দরকার। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তোলাকে অগ্রাধিকার দেব। তৃতীয় অগ্রাধিকার হলো, সমসাময়িক বিষয়গুলির সঙ্গে সংস্কৃতকে যুক্ত করা। যেমন ধরুন, গবেষণার মাধ্যমে কিংবা গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে এটা হতে পারে। আসলে যে কোনও কারণেই হোক সমসাময়িক বিষয়গুলি থেকে সংস্কৃত বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। সংস্কৃতের প্রাসঙ্গিকতা ফিরিয়ে আনতে গেলে এই বিষয়গুলির সঙ্গে সংস্কৃতকে যুক্ত করা আশু প্রয়োজন। আমরা সেটা করছিও।

**□ কর্মসংস্থানের বিষয়টা আপনার অগ্রাধিকারের তালিকায় নেই কেন?**

□ দেখুন, আমরা সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং সংস্কৃতের চাহিদা তৈরি করতে চাইছি। আর এটা করতে পারলে কর্মসংস্থান আপনা থেকে সৃষ্টি হবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কর্ণাটকের একটা শহর কারকারায় ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সংস্কৃত পড়ানো হয় অষ্টম শ্রেণী থেকে। আমরা শহরের বিভিন্ন স্কুলে সম্ভাষণ শিবির চালু করেছি সপ্তম শ্রেণী থেকে। এর ফলে সম্প্রতি অষ্টম শ্রেণীতে সংস্কৃত পঠন-পাঠনের চাহিদা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সেখানে স্কুলগুলি নতুন সংস্কৃত শিক্ষক নিয়োগে বাধ্য হয়েছে। আমাদের কাজে সমাজে সংস্কৃত শিক্ষক নিয়োগে বাধ্য হয়েছে। আমাদের কাজ সমাজে সংস্কৃতের চাহিদা বৃদ্ধি করা। আর এতে কর্মসংস্থান হতে বাধ্য। আমরা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারব না, আমরা চাদিদা তৈরি করতে পারি। আর এটাই ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে কর্মসংস্থানের পথ খুলে দেবে।

**□ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের বিশেষ কোনও পরিকল্পনা কি সংস্কৃত-ভারতীর রয়েছে? বিশেষতঃ স্বামীজী নিজে সংস্কৃতে একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। যুবকদের সংস্কৃতচর্চায় উৎসাহও দিতেন।**

□ ঠিকই। বিবেকানন্দের সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ, তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে আমরা বিশেষ পরিকল্পনা নিচ্ছি। এছাড়াও বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার অনুবাদ সংস্কৃততে জনপ্রিয় করার কথা মাথায় রয়েছে। দেশের যুব সমাজের প্রতি তাঁর বাণী সংস্কৃতের মাধ্যমে সংস্কৃত-অনুরাগী আধুনিক প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

**□ বলার অপেক্ষা রাখে না, এই চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।**

□ স্বস্তিকা সবসময় স্বাগত।

*(প্রচ্ছদসহ চ. মূ. কৃষ্ণশাস্ত্রীর ছবিগুলি শিবু ঘোষের তোলা)*

# চিঠিপত্র

## পরিবর্তনের হাওয়া

ইদানিং দেখছি বহুদিনের ভারতীয় সাংস্কৃতিক পত্রিকাতেও পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। হিন্দু রীতি-নীতি, সাধুসন্তদের নিয়ে যাচ্ছেতাই ছবি ও লেখা দেওয়া হচ্ছে। কখনও জল দূষণের চিত্রে শ্মশান তথা বিসর্জনের চিত্র দেওয়া হচ্ছে। যেন যত দূষণ হিন্দুরাই করে! আবার কখনও নবাঙ্কুর-এর পাতায় (৯.৭.১২) লেখা হচ্ছে সাধু-সন্তদের নামে মনগড়া কথা (উলটো পালটা-এর ২নং)।

এরকম লেখা নিয়ে আরও একটু চিন্তা ভাবনা করা উচিত।

—**সোমকান্তি দাস, রায়গঞ্জ।**

**প্রতিবেদকের বক্তব্য :**

প্রতিমা বিসর্জন ও পুজোর ফুল নদীতেই ফেলা হয়। এক সময় নদীতে কোথাও বাঁধ বা জলাধার ছিল না। স্রোতের টানে সব গিয়ে সাগরে পড়ত। এখন নদীস্রোতের সেই জোর নেই। উলটো পালটা শিরোনামে উল্টোপাল্টাই থাকবে। এটাই স্বাভাবিক, প্রতিবেদক নিজে সাধুদেরকে সুগন্ধি দ্রব্য কিনতে দেখেছেন। তা বলে সবাই নন। এটাকে ব্যতিক্রম বলেই ধরতে হবে। শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট করার জন্য নয়। সঠিক বাস্তব চিত্র তুলে ধরাই পত্রিকার এক অন্যতম দায়িত্ব।

## নারী নির্যাতনে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো বা এন সি আর বি এক সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে জানিয়েছে, সারাদেশে নারীদের উপর সংগঠিত অপরাধে পশ্চিমবঙ্গের স্থান একনম্বরে। ভারতে অবাক লাগে, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা সেই রাজ্যে নিজে মহিলারাই সবচেয়ে বেশি নির্যাতিতা। অর্থাৎ, নারীঘটিত অপরাধে সেই রাজ্যই দেশে শীর্ষে। এ লজ্জা যেমন এ রাজ্যের তেমনি এ রাজ্যবাসীরও।

রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, সারা ভারতে সংগঠিত ২ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৫০ টি অপরাধের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ২৯ হাজার ১৩৩টি, যা সারা দেশে সংগঠিত অপরাধের ১২.৭ শতাংশ। রিপোর্টে আরও দেখা যাচ্ছে, এই অপরাধ এ রাজ্যে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন—২০০৬ সালে এই অপরাধের তালিকায় এ রাজ্য ছিল ৬ নম্বরে। ২০০৭-এ উঠে আসে ৩-এ এবং ২০০৮-এও ছিল ৩-এ। ২০০৯ ও ২০১০-এ উঠে আসে আরও এক ধাপ, দু-এ। আর ২০১১-তে উঠে আসে ১ নম্বরে। তবে এ জন্য পুরো দোষ দেওয়া যায় না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মা-মাটি-মানুষ’ সরকারকে। কারণ বিগত বাম রাজত্বে বামেরা অপরাধের যে বিষবৃক্ষ বাংলার মাটিতে রোপণ করেছিলেন ৩৪ বছরে তা আজ পরিণত হয়েছে মহীরুহে। তাই এই অপরাধের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা হিসেবে বামেরা এর দায় এড়াতে পারেন না।

তাই বাংলার আমজনতা ভেবেছিলেন, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এলে তাঁরা বাটপাড়, দুর্নীতিবাজ ও লুটেরাদের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। মহিলারা নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন, নিরাপদ বোধ করবেন। কিন্তু একি! তাঁরা কী দেখলেন? মমতার রাজত্বে খুনোখুনি, রাহাজানি, তোলাবাজি, প্রোমোটারি, দুর্নীতি, নারী ধর্ষণ, নারী নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা এবং তা ক্রমবর্ধমান। তাই তাঁরা আজ বলতে বাধ্য হচ্ছেন, ‘যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।’ তাঁদের স্বগতোক্তি, নারীর রাজ্যে নারীরাই আজ সবচেয়ে বেশি নির্যাতিতা! অথচ এমনটি হওয়ার তো কথা ছিল না! আসলে মমতা তাঁদের ধোঁকা দিয়েছেন— প্রতারিত করেছেন। তবে তৃণমূলের শাসনে নারী নির্যাতন ও নারী ধর্ষণ বিশেষত পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণকাণ্ড রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে বে-আব্রু করে দিয়েছে।

—**ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।**

## ‘শ্যামাপ্রসাদ’ কি ব্রাত্য!

ছি ছি, এ লজ্জা রাখার জায়গা নেই। পশ্চিমবঙ্গের মখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৬ জুলাই ২০১২ পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্মদিন উদ্‌যাপন করলেন। যে জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে ১৯৯০ সালের ১৬ আগস্ট লাল্লু আলম নামে এক সিপিএম ক্যাডার হাজরা মোড়ে লোহার রড দিয়ে মেরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় পড়ে গেলে লাল্লু ছোরা বের করেছিল কণ্ঠনালী ছেদ করার জন্য। সে সময় একজন পুলিশ অফিসার রিভলভার বের করে লাল্লুকে বাধা না দিলে আজকের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা পেতাম না। আবার ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে এই জ্যোতি বসুরই মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার সঙ্গী-সাথীদের চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে

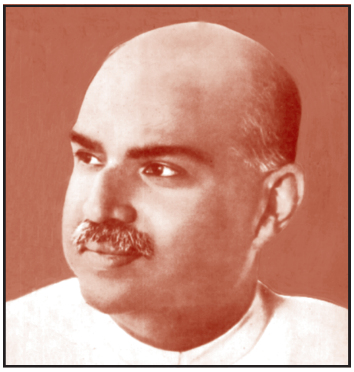

বের করে লালবাজারে নিয়ে যায়। এখন প্রশ্ন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ব্রাত্য কেন? মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বিভিন্ন মনীষী এবং স্মরণীয় ব্যক্তিদের জন্মদিনে তাঁদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে থাকেন। তাহলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর অনীহার কারণ কি?

এ কথা অনস্বীকার্য স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং সমগ্র বাংলা নিয়ে পাকিস্তান গঠনের যে দাবী মুসলিম লীগ রেখেছিল, তড়িঘড়ি গদির লোভে ভারতের জাতীয় নেতাদের অধিকাংশই সে দাবি মেনে নিতে রাজি ছিল। দেশভাগের আগে যখন একসময় রামমনোহর লোহিয়া এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নোয়াখালি গিয়েছিলেন তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু রামনোহর লোহিয়াকে বলেছিলেন : “If loosing such parts of the country we can hasten freedom, what harm !” পরে অবশ্য ১৯৫৯ সালে পার্লামেন্টে একথা

অস্বীকার করেছিলেন। মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবী এবং জাতীয় নেতাদের গদির লোভে দেশভাগ যখন অবশ্যম্ভাবী, দেশভাগ রোধ করার আর কোনও উপায় ছিল না, তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে রক্ষা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গকে। রক্ষা পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গবাসী হিন্দু, আশ্রয় পেয়েছিল লক্ষ লক্ষ হিন্দু যারা পূর্ব-পাকিস্তানে নিজেদের সাতপুরুষের ভিটে মাটি হারিয়ে নিজেদের সহায় সম্পদ বিসর্জন দিয়ে, কপর্দকশূন্য হয়ে এমনকি অনেকের নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীরা মুসলমানদের দ্বারা অপহৃতা হলে তাদের আর উদ্ধার করতে না পেরে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসে কুপার্স ক্যাম্প, ধুবুলিয়া প্রভৃতি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, কিন্তু অতীতকে ভুলে গিয়ে 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই, বিভেদ নয় ঐক্য চাই' শ্লোগান দিতে শুরু করলেন। ওই শ্লোগান তাদের সাতপুরুষের ভিটেমাটিতে গিয়ে কেন দেওয়া গেল না, এ প্রশ্নের জবাব নেই। বর্তমান সি আই টি ইউ নেতা শ্যামল চক্রবর্তী, প্রয়াত মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী কুপার্স ক্যাম্পের বাসিন্দা ছিলেন।

তখনকার দিনে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল না, ছিল ইউনিয়ন বোর্ড। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী অখণ্ড বাংলার প্রতিটি জেলার প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেখালেন পূর্ববঙ্গ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠন করা হয় তাহলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ কেন পাকিস্তানে যাবে পশ্চিমবঙ্গকে অবশ্যই ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তাঁর এ দাবীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ব্যারিস্টার এন সি চ্যাটার্জী এবং আরও অনেকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যুক্তিপূর্ণ দাবী অগ্রাহ্য করতে পারেনি তৎকালীন ইংরেজ সরকার। তাই বাংলা ভাগ হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত হয়েছিল ভারতের সঙ্গে। আজ যারা পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় রয়েছেন তাঁরা কি একবার চিন্তা করেও দেখার প্রয়োজন মনে করেন না, সেদিন পশ্চিমবঙ্গ রক্ষা না পেলে এঁরা কোথায় মন্ত্রিত্ব করতেন, কোথায় ক্ষমতার মধু লুটেপুটে খেতেন? সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ!

**—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
**ডেজিরে কমপ্লেক্স, চন্দননগর।**

## সাম্প্রদায়িকতার নিঃশব্দ পদধ্বনি

সম্প্রতি বেশ দেখা যাচ্ছে যে সারা ভারত জুড়ে রাজনৈতিক দলগুলির অযাচিতভাবে সংখ্যালঘু তোষণ আগামীদিনে ভারতীয় সমাজের কোন অশুভ বার্তা বহন করে আনবে। এটাই এখন দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের কাছে সব থেকে বড় অশুভ সংকেত। প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিই শুধুমাত্র সংখ্যালঘু ভোট কব্জা করার নেশায় যে রাজনৈতিক দাবা খেলায় মেতে উঠেছে তা ভারতের বুকে আগামী দিনে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের জন্ম দেবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

শুধুমাত্র নিজ নিজ দলের স্বার্থ রক্ষার্থে ও নিজের শাসন ক্ষমতায় আসন পাকা করতে তাদের এই অসাধু খেলা আর কতদিন দেশের জনগণ নীরবে মুখ বুজে সহ্য করবে সেটাই এখন লক্ষ্য করার বিষয়। এতদিন প্রায় দেশের সব রাজনৈতিক দলগুলিই দেশের অশিক্ষিত জনগণকে ভুল বুঝিয়ে ও নানা প্রলোভনে ভুলিয়ে যা খুশি তাই করে আসছিল। আজ যখন দেশের আপামর জনগণ স্পষ্ট বুঝেছে যে তাদের স্বার্থ তাদেরই বুঝে নিতে হবে। ওই অপেক্ষা করার দিন শেষ হইয়াছে। এইসব মেকী স্বার্থপর দেশদ্রোহী রাজনৈতিক নেতাদের স্বরূপ দেশবাসীর কাছে উদঘাটিত হচ্ছে ও তাদের নাভিশ্বাস উঠছে।

আর কেন্দ্রে অপদার্থ কংগ্রেস সরকারের দীর্ঘদিন ক্ষমতায় অবস্থানের ফলে একদিক দিয়ে যেমন দেশ সবদিকেই নির্যাতিত হইয়া এক সীমাহীন ঋণজালে দিনের পর দিন জড়িয়ে পড়ছে, অপরদিক দিয়ে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিই বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ক্রমশ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। আর তারই ফলে দেশ আজ সর্বদিক দিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে।

একদিকে যেমন কালো টাকার পাহাড় ক্রমশই বেড়ে চলেছে, অপরদিকে সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী ক্রমশই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ছে। দেশের সম্পদ চোরা পথে লুণ্ঠিত হয়ে মুষ্টিমেয় এক শ্রেণির ধনবান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হচ্ছে।

তারাই আজ দেশের ভাগ্যবিধাতা। আর তাদের অঙ্গুলিহেলনেই দেশ আজ পরিচালিত হচ্ছে। দেশের আপামর জনগণ এই দৃশ্যের নীরব দর্শক মাত্র। তাদের হাত পা আজ যেন এই সব নেতাদের কাছে বাঁধা পড়েছে। একেই বলে গণতন্ত্রের চরম বিপর্যয়। ভাবতে অবাক লাগে যে, ভারতের মাটিতে আজ সেই গণতন্ত্রই আত্মপ্রকাশ করছে। দেশবাসী সবকিছুই শুধু মুখ বুজে সহ্য করছে।

এমতাবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি শুধুমাত্র সংখ্যালঘু তোষণের ধুয়ো তুলিয়া দেশ ও দশের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে ভোটের আসরে অবতীর্ণ হয়েছে।

তাই বলি ভারতীয় গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার্থে সকল দেশবাসীর উচিত এইসব মেকী দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতাদের প্রকৃত চরিত্র মূল্যায়ন করে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। নতুবা আগামীদিনে এ দেশ সম্পূর্ণভাবে ঋণজালে জর্জরিত হয়ে আদর্শটুকু চিরতরে বিসর্জিত হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কারণ গণতন্ত্রে মূল কথাই হলো জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনে আদর্শের পূর্ণ বিকাশের নিরাপত্তা।

**—পাঁচুগোপাল ঘোষ, নরেন্দ্রপুর,**
**হাওড়া।**

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ন
মাত্র দুই মিনিটে ৈির তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

পরম্পরা

# পুরান কথায় রাখী-বন্ধন

**স্বামী প্রবরানন্দ গিরি**

প্রভু শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশে ত্রিলোক ভ্রমণে বেরিয়েছেন নারদ। মাঝে মাঝে এরকম তাঁকে করতে হয়। তবে এবার তিনলোক নয়, মুখ্য যাত্রা একটি লোক। অন্য দুটি লোক গৌণ। বেরোনোর আগে নারদ মনে মনে গায়ত্রী মন্ত্রদুটো আউড়ে নিলেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদ। তাঁর কোনও গর্ভধারিণী মা নেই। এছাড়া তিনি চিরজীবী। সত্য-ত্রেতা- দ্বাপর-কলিতে তাঁর অবাধ বিচরণ। তিনি ধুরন্ধর বিষ্ণুভক্ত। 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' ছাড়া মুখে অন্য কোনও নাম নেই। মনে মনে প্রভুর নাম জপে চলেন সর্বক্ষণ আর বীণা বাজান। বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীকে তিনি পিতৃমাতৃজ্ঞানে ভক্তি করেন। বিষ্ণুর নির্দেশ---'স্বর্গ আর পাতালটা খালি একবার চক্কর মেরে নিও। মর্ত্যের ভ্রমণটাই আসল। আজকাল এই কলিকালে তিনটে লোকের মধ্যে স্বর্গে কোনও ঝুট-ঝামেলা নেই। আর পাতালের অসুররা তাদের লোক ছেড়ে সবাই মর্ত্যলোকে জমায়েত হয়ে তাকে মৃত্যুলোক বানিয়ে ছেড়েছে। পাতালে সেই সুযোগে গ্যাস, খনিজ তেল, আগুন আর আগ্নেয়গিরিরা সক্রিয় হয়েছে। মাঝে মাঝেই যত্রতত্র ভূমিকম্প আর অগ্ন্যুৎপাত ঘটাচ্ছে। অসুরদের জমায়েতের ফলে মর্ত্যলোকে সন্ত্রাস, ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি, কাটাকাটি অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। ক'বছর আগে সন্ত্রাসবাদী হানায় আমেরিকার বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের সুউচ্চ অট্টালিকা ধ্বংস হয়েছে। এখন অসুররা এখানে ওখানে রেলগাড়ীতে আক্রমণ ও দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে। ভারতবর্ষের সংসদসহ বিভিন্ন জায়গায় তারা আক্রমণ এবং হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। অসুরদের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম থেকে আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা কোনও মহাদেশই বাদ নেই। এসব করতে তারা অত্যাধুনিক দূরনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তিও ব্যবহার করছে। তুমি এসব ভাল করে দেখে, শুনে ছবি তুলে নিয়ে এসে আমাকে রিপোর্ট কোরো। আমাকে আবার ব্রহ্মা আর মহেশ্বরের সঙ্গে পরের মিটিং-এ এসব নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

কতদিন হয়ে গেল সেই সত্যনারায়ণের রূপ ধরে মর্ত্যলোকে গেছি সত্য দেবের মাহাত্ম্য প্রচার করতে। খবর নিও এখন

মানুষেরা সেসব উপদেশ পালন করে কিনা। আর হ্যাঁ, একটা কথা বলে দিই। মানুষের কাছাকাছি গেলে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে অদৃশ্য হয়ে সব কিছু দেখবে শুনবে। বলা যায় না কখন কি ঘটে, দিনকাল যা খারাপ মর্ত্যলোকে! আর তোমার ল্যাপটপ এবং ডিজিট্যাল ক্যামেরাটা সঙ্গে নিতে ভুলো না। মোবাইল ফোনটাও। আপতকালে আমাকে স্মরণ করতে এটি ধ্যানের থেকে অধিক কার্যকরী।"

যাইহোক, ঋষিবর নারদ এখন অষ্টপ্রহর ব্যস্ত পিতৃবর শ্রীবিষ্ণুর জন্য খবর সংগ্রহে। মর্ত্যলোকের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে প্রভুর কাছ থেকে শোনা কথাগুলির সত্যতার অনেক প্রমাণ পেলেন। ডিজিট্যাল ক্যামেরায় তোলা ছবিসহ খবরগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ল্যাপটপবন্দী করতে থাকলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় আকাশমার্গে বাংলার বিষ্ণুপুর নগরের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। নগরের নামটি জানতেই তিনি ভক্তিতে আপ্লুত হলেন। আহা, এ নগর যে প্রভুর শুভনামধন্য! নগরকেন্দ্রে আলোকিত এক বড় মঞ্চের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতা শান্ত হয়ে বসে একমনে কথকতা শুনছেন। কথকঠাকুর বসে দাঁড়িয়ে নেচে বেশ নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন এবং মাঝে মাঝে সুললিত কণ্ঠে প্রভুর নামগান করছেন। পাশে নানারকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাদ্যকেরা গানের সঙ্গে সঙ্গত করছেন। শ্রোতারা ভাগবৎ কথা এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নিয়ে কথকতা খুব উপভোগ করছেন। তাঁরা কখনো হাসেন, কখনো গম্ভীর হন, আবার কখনো ভক্তিরসের আবেশে কাঁদেন। দেবর্ষি নারদ দেখলেন বেশ মজার ব্যাপার তো। তাঁরই বেশ ধারণ করেছেন কথকঠাকুর, হাতে বীণাটিও আছে। শুধু ঢেঁকিটা নেই। বোধহয় ওড়ার দরকার হবে না তাই। নারদ ঠিক করলেন এখানকার ব্যাপারটা ভালো করে প্রত্যক্ষ করতে হবে। তক্ষুণি প্রভুর অদৃশ্য হওয়ার উপদেশটি মনে পড়ল। ঢেঁকিটা মঞ্চ থেকে একটু দূরে অন্ধকারে একটা গাছের আড়ালে রেখে নিজে অদৃশ্য হলেন। তাঁকে কেউ দেখতে পেল না। কিন্তু তিনি সব দেখতে, শুনতে পাচ্ছিলেন।

কথকঠাকুর তখন সামাজিক বিষয় নিয়ে কথকতা শুরু করেছেন। বলছেন— বাবা মায়েরা, সকালে উঠেই তোমাদের প্রথম চাই চা— তাই না? তা ভক্তদের জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে যে তারা চা পান করে শাস্ত্রীয় বিধিই নিখুঁতভাবে পালন করে। শাস্ত্রে বলেছে— 'নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।' মানে চা নিবেদন করতে হবে আত্মাকে, তবেই তার গতি পরমেশ্বরের দিকে হবে! ভক্তদের কাছে এ হলো শাস্ত্রের নির্ভেজাল অর্থ। এটা তারা কদাচ অবহেলা করে না। বাবারা, চায়ের সঙ্গে তোমাদের চাই বিড়ি বা ধূমপানের বস্তু। বড়-ছোট অনেকেই এতে আসক্ত। ছোটরা তো বাবা-দাদা, মামা-কাকারা যা করেন সেটাকেই ঠিক বা স্বাভাবিক বলে মনে করে তার অনুসরণ করে। আর একবার অভ্যাস হয়ে গেলে

সিটিকে ছাড়তে পারে না। তখন অন্য কেউ ধূমপান করছে দেখলে তাদেরও মনে হয় আমরাও দুটো টান দিই। এই যে বিড়ি, তা হলো পানকারীদের কাছে স্বর্গের সিঁড়ি। স্বর্গে গিয়ে কে না সুখ ভোগ করতে চায়? বিড়ি খেয়ে যদি স্বর্গসুখের ব্যবস্থা হয়ে যায় তবে কে ছাড়ে? বিড়ি যে স্বর্গের সিঁড়ি তা নিয়ে অনেক গান চলে বাজারে। শুনবে তেমন গান? অমনি বাজনদারদের তান শুরু হলো। কথকঠাকুর বীণা বাজিয়ে গান ধরলেন সুমধুর কণ্ঠে। সুরটা বাউল সঙ্গীতের।

*বিড়ি স্বর্গের সিঁড়ি রে ভাই, বিড়ি স্বর্গের সিঁড়ি।*
*বুক ঝাঁঝরা, পেট ঝাঁঝরা, ঝাঁঝরা দেহের নাড়ি,*
*তবু বিড়ি ছাড়বে না ভাই, বিড়ি স্বর্গের সিঁড়ি।*
*গড়গড়াতে তামাক নাই, ঢুকেছে সে পাউচে,*
*জোয়ান-বুড়ো সেসব সদা চিবোয় নেচে নেচে।*
*কিছু না পেলে সকালবেলায় খেতে যায় যে তাড়ি,*
*নেশা করে ঘরে বসেই স্বর্গে দেবে পাড়ি।*
*বিড়ি স্বর্গের সিঁড়ি রে ভাই, বিড়ি স্বর্গের সিঁড়ি।*

আর এসব দেখে অন্তর্যামী ভগবান কি করেন? তিনি হাসেন।

কথকঠাকুর এরপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। শুরু করলেন গৃহস্থের দিনচর্চার কথা। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সংসারের কাজে ব্যস্ত। এর মধ্যে স্ত্রীর চিন্তা কি করে পছন্দসই শাড়ী, গয়নাগাঁটি আদায় করা যায়, কি করে পতিদেবতাটিকে বশে রাখা যায়। তার কলাকৌশল নারদ মুনি মা লক্ষ্মীকে শিখিয়েছিলেন।

হঠাৎ নিজের নাম শুনে নারদ চমকিত হলেন। মনে পড়ল অনেকদিন আগের কথা— সেই সত্যযুগের। দৈত্যরাজ বলির তখন দানের দাপট চলছে। বিষ্ণু ভাবলেন এ দাপট খর্ব করতে হবে। 'অতি' সব ব্যাপারেই খারাপ— দানেও। সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্। কথকঠাকুরের কথকতার সূত্রে একে একে সেই ঘটনার দৃশ্যাবলী নারদের মনশ্চক্ষে উদয় হল।

দেবর্ষি নারদের চিরকালের অভ্যাস সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য, স্নান-আহ্নিক সেরে বৈকুণ্ঠে গিয়ে শ্রীহরির দর্শন করা। তারপর সেখানেই ভরপেট প্রাতঃরাশটি সারা। সেদিন সকালে অবশ্য প্রভুকে দর্শন করতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। খুব ভোর ভোর উঠে প্রভুরই এক জরুরি কাজে তাঁকে একবার কৈলাসে দেবাদিদেবের কাছে যেতে হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় ফিরে সবে আহ্নিকে বসেছেন এমন সময় অদ্ভুত দৃশ্য। সামনে দেখছেন প্রভুকে— দারোয়ানের বেশে দণ্ডহাতে দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন। অবাক হলেন নারদ। এ আবার কি! জায়গাটাও তো বৈকুণ্ঠ নয়। এতো দৈত্যরাজ বলির রাজদ্বার। প্রভুর গুপ্তচরগিরি করার সুবাদে জায়গাটা আগে দু একবার দেখা আছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল— 'প্রভু মুষড়ে আছেন। বললেন, 'নারদ, ভীষণ বিপদে পড়েছি। দুপুর থেকে বলির রাজবাড়ীর গেটে লাঠিহাতে পাহারা দিচ্ছি। সব কথা ধ্যানে বলা যাবে না। তুমি এক্ষুনি একবার সশরীরে এখানে চলে এস।' প্রভুর বিপদ শুনে নারদের তখন মাথা ঘুরছে, মুখে রা নেই। যাইহোক, পড়ি কি মরি করে ঢেঁকিতে চড়ে সঙ্গে সঙ্গে পাড়ি দিলেন। যে কোন প্রকারে যত শীঘ্র সম্ভব প্রভুর কাছে পৌঁছতে হবে। পাতাল। সেখানে সোনার রাজবাড়ী। তার সিংহদ্বার হানা দিতে হবে!

বেশী দেরী হলো না অকুস্থলে পৌঁছতে। পৌঁছেই নারদ কেঁদে ফেললেন প্রভুকে দেখে। তবে স্তব করতে ভুললেন না—

উদাসনেত্রে বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছেন, হাতের লাঠিটা উল্টেপাল্টে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন। বললেন, দেখ নারদ এখন কান্নাটান্না রাখো। প্রথমে সব ঘটনা, তারপর উদ্ধারের পরিকল্পনা শোনালেন।

তখন গভীর রাত। বিষ্ণু শয়নকক্ষে শয্যায় মা লক্ষ্মীর পাশে ঘুমোচ্ছেন। এমন সময় নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্যের সুগন্ধে শয়নকক্ষে পূর্ণ হয়ে গেল। বিষ্ণুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। মা লক্ষ্মী তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। লুচি, পোলাও, পায়েস, সন্দেশ, হালুয়া, আরও নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্যের সুগন্ধ বিষ্ণুর মাথায় নেশা ধরিয়ে দিল। সেইসব সুগন্ধি সুখাদ্যের কাছে রোজ রোজ লক্ষ্মীর হাতে ছ্যাঁচড়া, শাকচচ্চড়ি আর পান্‌সে ঝোল-ভাত কোথায় লাগে? দূর দূর! ভাবলেন তার থেকে রেহাই পেতে হবে। মা লক্ষ্মীকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে মাঝরাতে চুপি চুপি বৈকুণ্ঠ থেকে বেরোলেন তিনি। গন্ধের সূত্র ধরে সোজা ভৃগুকচ্ছে যজ্ঞবাড়ীতে পৌঁছে গেলেন। ওরে বাবা! এলাহি কাণ্ড! বড় বড় তপ্ত কটাহে হরেক রকম সুখাদ্য পরিপক্ব হচ্ছে। সারা যজ্ঞবাড়ী রান্নার সুগন্ধে ম ম করছে। মাথা ঠিক রাখাই দায়! পরদিন দ্বিপ্রহরে যজ্ঞের পূর্ণাহুতির পর ভোজন সমারোহ হবে, দান দেওয়া হবে ব্রাহ্মণ, মুনি আর তপস্বীদের। সব ব্যবস্থা করেছেন দানবীর দৈত্যরাজ বলি।

বিষ্ণু দেখলেন এখানে দেবতার বেশ চলবে না। চুপিসাড়ে তিনি বামনরূপে ধারণ করলেন। হাতে একটি বিশাল ছাতা, মুণ্ডিত মস্তকে দোদুল্যমান বড় একটি টিকি। গলায় মোটা উপবীতটি যাতে সবার নজরে পড়ে তার ওপর বিশেষ মনোযোগ দিলেন। মধ্যাহ্নে দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ ভোজন ভালই হলো। দান চাইবার সময় চতুরতা করে চাইলেন ত্রিপদ ভূমি। পা-কে এমন বড় করলেন যে দুই পায়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ঢেকে গেল। এখন তৃতীয় পদটি রাখবেন কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে বলি কাপড় দিয়ে ঢেকে নিজের মাথাটি পেতে দিলেন। বিষ্ণু সহর্ষে বলির মাথায় পা রাখতে সব দখল হয়ে গেল। স্বর্গ মুক্ত হলো দৈত্যের হাত থেকে। তাঁর নির্দেশ মেনে বলিকেই পাতালে রাজত্ব করতে বললেন। আর মাথা তুলো না, বাবা!

দান গ্রহণের একটি নিয়ম আছে— দানে সন্তুষ্ট হলে বর দিতে হয়। ভোজন এবং দানে তুষ্ট ছদ্মবেশী বিষ্ণুর মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল— 'বর চাও। যা চাইবে তাই দেব'। আর এইখানেই ঘটল বিপদটা, যা বিষ্ণুর কল্পনাতীত ছিল। বলি তো খুব ভক্তি সহকারে হাতজোড় করে বলল, 'প্রভু, আপনার সান্নিধ্য মানেই তো অভেদ্য, অকাট্য, অবিনশ্বর সুরক্ষা। আপনার কৃপা আমায় রক্ষা করুক এই প্রার্থনা। আপনি আমার দরজায় চিরকালের জন্য পাহারা দিন। এই বলে চাকরকে দিয়ে লোহা বাঁধানো মোটা একটি দণ্ড এনে ছদ্মবেশী বিষ্ণুর হাতে ধরিয়ে দিল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে বিষ্ণুর তখন কালঘাম ছুটছে। আর বামনের বেশে থাকতে পারলেন না। আসল রূপটি বেরিয়ে পড়ল। বলি তখন মনে মনে হাসছে। বামনদেবই হও আর ভগবান বিষ্ণুই হও, এখন

তো তুমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিন পা জায়গার নামে ত্রিলোক হাতিয়ে নিয়েছ! এখন বিষ্টু দারোয়ান হয়ে দাও পাহারা!

বিষ্ণু আর কি করেন? সুড়সুড় করে ডান্ডাহাতে পাহারা দেওয়া শুরু করলেন। এদিকে বলি তখন স্তব শুরু করেছেন—

সব শুনে নারদ শুধোন— 'প্রভু, এখন উপায়? বলি তো এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছে। আপনাকে বৈকুণ্ঠছাড়া করেছে, আবার নিজের ভৃত্য বানিয়ে নিয়েছে।' বিষ্ণু বললেন, 'আছে নারদ, একটা উপায় আছে। ঘুমন্ত অবস্থায় লক্ষ্মীকে ছেড়ে আসার ফল আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। এখন একমাত্র লক্ষ্মীই আমাকে উদ্ধার করতে পারবে।' এরপর ফুসফুস করে গুপ্ত মন্ত্রণা করলেন নারদের সঙ্গে। সব বুঝিয়ে দিলেন। রওনা হবার আগে বার বার করে বললেন, ভুলো না নারদ— লক্ষ্মী সমুদ্রকন্যা, দৈত্যরা সম্বন্ধে তার ভাই। আগামীকাল রাখীপূর্ণিমা! বলিকে রাখী বাঁধতে লক্ষ্মী অবশ্যই যেন আসে।' প্রভুর নির্দেশ নিয়ে নারদ যাত্রা বৈকুণ্ঠের দিকে।

মা লক্ষ্মী মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখলেন পাশে নারায়ণ নেই। ভাবলেন হয়তো বাথরুমে গেছেন। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তিনি ফিরলেন না। তখন বিছানা ছেড়ে উঠে অন্য ঘরগুলো দেখলেন, বাইরে বাগানটায় খুঁজলেন। না কোথাও নেই তিনি। কি হলো? লক্ষ্মী ঘাবড়ে গেলেন। অনেক উল্টোপাল্টা চিন্তা এল মাথায়। ভাবলেন, 'স্বামীকে এতদিনেও চিনতে পারলাম না। তিনি কি স্বভাবের! রাতে আমাকে ছেড়ে আবার অন্য কারও কাছে গেলেন না তো? আমি সমুদ্র-মন্থন থেকে যখন উঠলাম, তখন কত বড় বড় মুনি ঋষি দেবতারা সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আমার বরমাল্য পাবার জন্য। আমি তাদের কাউকে পাত্তা না দিয়ে মনমোহন মদনমোহন রূপ দেখে বিষ্ণুর গলায় মালা দিলাম। আর এখন তাঁর এই ব্যাভার! আমি জেগে না গেলে জানতেই পারতুম না। কখন ফিরে এসে পাশে আবার টুপ করে শুয়ে পড়ত। আমি আর ঘুমুচ্ছি না। এই পাহারায় বসলুম। ফিরে আসুক একবার। তখন একটা হেস্তনেস্ত করবো।'

লক্ষ্মী বৃথাই বাকি রাত অপেক্ষায় রইলেন, বিষ্ণু ফিরলেন না। পরদিনও না। সকাল হতেই লক্ষ্মী সম্ভাব্য সকল জায়গায় সন্ধানের জন্য লোক পাঠালেন। নিজে বৈকুণ্ঠের সব আড্ডাগুলি খুঁজে দেখলেন। না, কোথাও বিষ্ণুকে পাওয়া গেল না। ঠিক সেদিনই আবার নারদ কৈলাসে গেছে। স্নানাহার ভুলে লক্ষ্মী সারাদিন উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলায় নারদের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় রইলেন।

যথাসময়ে দেবর্ষি বীণাহাতে 'নারায়ণ' করতে করতে মা লক্ষ্মীর সকাশে উপস্থিত হলেন। একটু আগেই বলির রাজদ্বারে প্রভুকে দর্শন করে এসেছেন। তিনি ঘটনা সবই জানেন। কিন্তু এমন ভাণ করলেন যেন কিছুই জানেন না। তাঁর স্বভাবই হলো মনে মনে প্যাঁচ কষা আর ফন্দি ফিকির বের করা। লক্ষ্মীকে দেখেই তাঁর মনের অবস্থা বুঝে গেলেন। লক্ষ্মী কিছু বলার আগেই তাঁর স্তব শুরু করে দিলেন—

সৎপুরুষদের মধ্যে শ্রদ্ধারূপে এবং কুলীনদের মধ্যে লজ্জারূপে নিবাস করেন, সেই বিশ্বপালিনী দেবীকে নমস্কার।

নারদকে দেখে লক্ষ্মীর বুকে বল এল। বললেন, 'এই বিপদের দিনে, বাবা, একমাত্র তুমিই আমার ভরসা। কাল মাঝরাত থেকে আমাদের প্রভু নিরুদ্দেশ। সারাদিন কত খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু সন্ধান পেলাম না। এখন তুমি এসেছ। আমি জানি, তুমি ঠিক খুঁজে বের করতে পারবে প্রভুকে'। তারপর নিজের সন্দেহের কথা বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি জানো, কারও কাছে যান নাকি তিনি?' তারপরেই বললেন, 'আমার সন্দেহের কথা যেন আর কাউকে বোলো না, প্রভুকে তো নয়ই। তুমি আবার প্রভুর যা ভক্ত!'

নারদ দেখলেন এই সুযোগ। প্রভুর মুক্তির ব্যবস্থা করা হবে, আর মা লক্ষ্মীকেও শেখানো পড়ানো যাবে। বললেন, 'মা, অপরাধ নেবেন না। এতদিন ঘর-সংসার করলেন আর স্বামীকে কি করে বশে রাখা যায় সেই কৌশলটা জানা হলো না? আপনার সন্দেহের কোনও কারণ নেই— প্রভু আপনার বশেই আছেন। কিন্তু তাঁর নোলাটা বশে নেই— তা জানেন? আপনি দিনের পর দিন শাকচচ্চড়ি, ছ্যাঁচ্‌ড়া আর পান্‌সে ঝোল-ভাত খাইয়ে প্রভুর নোলাটি চট্‌কে দিয়েছেন। এই অবস্থায় যদি কোথাও ফ্রিতে ছাপ্পান্ন ভোগ পাওয়া যায় তবে নোলা শক্‌শক্ করবে না? আমাদের প্রভুর হয়েছে তাই। যজ্ঞিবাড়ীতে ভরপেট ভালমন্দ খেয়ে বর দিয়ে ভক্ত বলিরাজার হাতে বন্দী হয়েছেন তিনি।' এরপর লক্ষ্মীকে বিশদে ঘটনার বিবরণ দিলেন।

তারপর বিষ্ণুর নির্দেশমতো নারদ লক্ষ্মীকে বললেন, বলিরাজার কাছে গিয়ে প্রভুকে ছাড়িয়ে আনতে। লক্ষ্মী হলেন বলির পাতানো বোন। ইন্দ্রের ভয়ে অসুরেরা যখন সমুদ্রের ভিতর লুকিয়ে ছিল তখন তারা সমুদ্রকেই পিতা বলে মেনে নেয়। আর লক্ষ্মীও সাগরকন্যা, সমুদ্র মন্থনেই তাঁর উদ্ভব। নারদ লক্ষ্মীকে একটি রাখী দিয়ে বললেন, পাতালে গিয়ে সেটি বলিরাজের হাতে বেঁধে দিতে। তারপর বলি যখন প্রতিউপহার দিতে চাইবে তখন প্রথমে তাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করিয়ে প্রভুর মুক্তি চাইতে হবে। যাইহোক, নারদের এই কূট-কৌশলে বিষ্ণুর মুক্তি হলো। তখন থেকেই মা লক্ষ্মী প্রতিজ্ঞা করলেন প্রভুর রসনা তৃপ্তির ব্যাপারে তিনি আর কখনই অবহেলা করবেন না! কথকঠাকুর বললেন, 'আমাদের মা জননীদের ভালমন্দ রান্নার কায়দাটি অজানা নয়।' এবার তাঁর উপদেশ, 'যখন দেখবে খেয়েদেয়ে পতিদেবতাটির মুখে তৃপ্তির ছাপ তখন কথাটি পাড়বে— 'ওগো শুনছো, এবারে পুজোর সময় একজোড়া কানপাশা চাই কিন্তু— নতুন ডিজাইনের!' পতিদেবতার মুখের 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' হতে বেশী দেরী হবে না। আর পতিদের প্রতি তাঁর উপদেশ, 'মা জননীদের কাজের কদর করবে। শ্রীবিষ্ণুর মত বিপদে পড়লে তারাই কিন্তু উদ্ধার করবে।'

নারদ এতক্ষণ কথকতায় মজে ছিলেন। খুশীতে ডগমগ। মনে মনে বললেন, 'বৃদ্ধ ব্যাসদেব সব কাহিনী লিখে না গেলে এসব কথা কেউ মনে রাখতো না। প্রভু, মা লক্ষ্মী আর আমার কথা কেউ জানতে না এতযুগ পরে। এখন কথকতার আসর ছেড়ে আবার যাত্রা করি, মর্ত্যলোকভ্রমণ অনেকটাই বাকী আছে। নারায়ণ, নারায়ণ!' ◻

*(লেখক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসী, গুজরাট)*

## গ্রামের লাইব্রেরিতে সানডে ক্লাস

# রবীন্দ্রনাথের গান মাতিয়ে দিল সকলকে

সানডে ক্লাসের ভাবনাটা বিষ্ণুপদর। গ্রামের লাইব্রেরির অন্যতম সংগঠক। সম্পাদক ছিলেন তখন। বড়রা বলে ‘বিষ্টুদা’ অল্পবয়সীরা ‘বিষ্টুকাকা’ কিংবা ‘বিষ্টুজ্যেঠু’। বয়সে যারা বড় তারা বলে বিষ্টু। সাধারণ মাপের মানুষ, কেষ্টবিষ্টু নন। কিন্তু গ্রামের মানুষের কাছের মানুষ। লাইব্রেরি নিয়ে তাঁর ভাবনা অনেক। গ্রামের মঙ্গলচিন্তা ঘিরে থাকে সবসময়। শহরে থাকেন কাজের জন্যে। চাকরি এক নামকরা সংস্থায়। শনিবারে বাড়ি ফেরা। বাড়ি আসা কম ঝক্কির নয়। রেল পথে দেড় ঘণ্টা। আবার নদীপথে নৌকোয় দুঘণ্টা। নিজেদের ও আশেপাশের গ্রামের অনেকের সঙ্গে দেখা। গল্প করতে করতে দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে গ্রামে নদীপথে চলাটা মন্দ লাগে না। সপ্তাহ শেষে বাড়ি ফেরার জন্যে সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র থাকে। বাড়ি থেকে কেউ-না-কেউ সাইকেল আর টর্চ নিয়ে আসে। বিষ্ণুপদ আগে সাইকেলে চড়তেন। একটা দুর্ঘটনার পর সাইকেল চড়া ছেড়েছেন।

যে এসেছিল গ্রাম থেকে সে ব্যাগপত্তর সাইকেলে তুলে চলে গেলো। দিয়ে গেলো টর্চ। পাঁচ ব্যাটারি টর্চটা বাড়ি এলেই ব্যবহার করেন। চোখের জন্যে অল্প আলোয় অসুবিধে হয়। হাঁটতে হাঁটতে গ্রামে ফেরা, কয়েকজন সঙ্গী থাকে গল্প করার। ওইভাবে একবার ফেরার সময় গ্রামের একজন বয়স্ক মানুষ বলেছিলেন, ‘তোমরা রবিবারে গ্রামের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিছু করতে পারো লাইব্রেরিতে। তাদের ভাবনার সঙ্গে পরিচয় করবে। তোমাদের কথা জানাবে। কেউ কেউ নিজের লেখা পড়বে। কেউ গান গাইবে আবৃত্তি করবে। একটা বোর্ড থাকবে, সেখানে ছবি এঁকে আটকে দেবে কেউ। কেউ গল্প শোনাবে। রাজনীতি আর ধর্ম আলোচনার মধ্যে না আনাই ভালো।’ বিষ্ণুপদর ভালো লাগে প্রস্তাব। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘আমরা কালই সিদ্ধান্ত নেবো। আশা করছি পরের রবিবার থেকে শুরু করা যাবে। আপনি কিন্তু থাকবেন মেজদা।’ হরিসাধন দত্তকে ‘মেজদা’ বলেন বিষ্ণুপদ দে।

প্রথম অধিবেশনে হাজির অনেকেই। বেশ উৎসাহ। বিষ্ণুবাবুর বাড়ি থেকে এলো খাবার। প্রত্যেকের জন্যে। লাইব্রেরিয়ান প্রভঞ্জন দে খুব উৎসাহে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সামলালেন। কেউ গান করল, কেউ আবৃত্তি। গল্প বললেন ভানুলাল ভট্টাচার্য। সুধন্বা সামন্ত আর প্রসাদ সাহু গরম লুচি আর টাটকা বোঁদে প্রত্যেকের হাতে তুলে দিলেন। প্রথমদিনেই বেশ জমে গেলো সানডে ক্লাস। হরিসাধন বললেন, ‘সামনের সপ্তাহে আমাদের বাড়িতে আসছেন আমার শ্বশুরমশাই আর এক শ্যালক। ওঁরা রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে কিছু বলতে পারেন। এটা আমার প্রস্তাব। তোমরা রাজি হলে আমি বলবো ওঁদের।’ বিষ্ণুপদ বললেন, ‘আমরা রাজি। মেজদা, আপনি কথা বলে রাখুন।’

পরের সপ্তাহে সানডে ক্লাসে এলেন বিমলাক্ষ রায় আর তাঁর ছেলে শুভ্রাংশু। দুজনকে দুটো আসন উপহার দিলেন বিষ্ণুপদ। বুনেছে গ্রামের এক গৃহবধূ। বিমলাক্ষ বললেন, ‘এ গ্রামে আমি এসেছি আগে অনেকবার। আমার পুত্র এবারই প্রথম এলো। গ্রামের মধ্যে ছোটোদের নিয়ে এরকম ব্যাপারে আমরা খুশি। এখন বর্ষা। আমরা জানি বাংলার বর্ষার দারুণ রূপ, কত বৈচিত্র্য। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা বর্ষার গান আমরা গাইবো। সেই সঙ্গে কিছু কথা থাকবে। বাইরে থমথমে আকাশ। বৃষ্টি আসছে। আমরা শুরু করছি ‘বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো।’ বিমলাক্ষ হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শোনালেন। শুভ্রাংশু খালি গলায় গাইলেন। কোনও বইটই দুজনের দরকার হলো না। গানের সুর মনে আছে, কথাও! প্রসাদ সাহু ভেবেছিলেন কথা ভুলটুল হতে পারে। ‘গীতবিতান’ সামনে রেখেছিলেন। মিলিয়ে দেখলেন দুটো গান, কোনও ভুল নেই। এও এক অভিজ্ঞতা।

পিতা-পুত্র দুজনে গাইলেন পনেরোটি গান। লাইব্রেরিতে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান হচ্ছে শুনে হাজির হয়েছিল অনেকে! ছোটো বড় সকলের মন ভরে গিয়েছিল সেদিন। বিষ্ণুপদ বললেন, ‘আবার কবে এমন গান শোনার সুযোগ হবে?’ বিমলাক্ষ বললেন, ‘আমরা পরশু চলে যাচ্ছি। আবার যখন আসবো তখন ছোটোদের গান শুনবো। ওদের গান শেখান। রবীন্দ্রনাথের গান।’

**কৌশিক গুহ**

## মধুসূদন বসুর বেড়ানো

### ছাত্রদের নানা জায়গায় বেড়ানো দরকার

বেড়ানোর বই নিয়মিত পড়েন মধুসূদন বসু। পয়সা জমিয়ে বেড়াতে যান নানান জায়াগায়। কোনও ভ্রমণ-সংস্থার সঙ্গে যান না। কারণ তারা অনেককে নিয়ে যায়। অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে চলা কঠিন। কারণ তাঁর খাবার অভ্যেস মেলে না কারও সঙ্গে। আর কোনও কোনও জায়গা একটু ধৈর্য নিয়ে ধীরেসুস্থে দেখতে চান। ভ্রমণ-সংস্থা বড় বেশি তাড়া লাগায়। কিছু জানা দেখা হয় না ভালো করে। সেজন্যে তিনি একা একা ঘোরা পছন্দ করেন। কলেজে পড়ান। পুজোর ছুটিটা কাজে লাগান। গরমের কষ্ট নেই সেসময়। খাওয়ার-দাওয়ার সমস্যা নেই। থাকারও। কিছু ওষুধপত্র সঙ্গে রাখেন। কাপড়চোপড়। নোট খাতা, ক্যামেরা। একটা স্টিলের পাত্র। সব জায়গাতেই চিঁড়ে দই কলা চিনি ইত্যাদি পাওয়া যায়। বেড়াতে গিয়ে খাওয়ার জন্যে বেশি ভাবলে কাজ হবে কি করে?

একমাস টানা বেড়ানোর পর ফিরে এসে নোটবুক আর সংগ্রহ করা তথ্য নিয়ে বসতেন। সব গুছিয়ে নিয়ে লেখা শুরু করতেন। কিছুদিনের মধ্যে লেখা শেষ হোত। তারপর সেই পাণ্ডুলিপি ছাপতে দিতেন। ইংরেজি নতুন বছরের প্রথমে বই বেরিয়ে যেত। ওইভাবে অনেকগুলো বই লিখেছিলেন।

সাশ্রয় করে বেড়ানোর কাজ মধুসূদন পছন্দ করলেও ছাত্রদের বলতেন, 'তোমরা বাড়ির সকলের সঙ্গে বেড়াবে। অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবে। লিখবে বিবরণ, আঁকবে। ছবি তুলবে। বেড়ানোর আনন্দকে উপভোগ করতে হবে। নানারকম ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়বে।'

**বইমিত্র**

## প্রশ্নবাণ

১. প্রফেসর শঙ্কুর স্রষ্টার নাম কি? কোন্ ধরনের লেখার চরিত্র?

২. ঘনাদা, টেনিদা, ব্রজদার স্রষ্টা তিনজন লেখকের নাম?

৩. মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কোন পেশায় যুক্ত ছিলেন? তাঁর দাদামশাই-এর নাম?

৪. বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ্ রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নাম?

৫. এ সময়ের এক নামী অর্থনীতিবিদের মাতামহ, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে আসেন। অর্থনীতিবিদ ও তাঁর মাতামহের নাম? কোথা থেকে এসেছিলেন?

**উত্তর :** ১. সত্যজিৎ রায়। সায়েন্স ফিকশান। ২. প্রেমেন্দ্র মিত্র। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। গৌরকিশোর ঘোষ। ৩. পরিসংখ্যান। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। ৫. অমর্ত্য সেন। ক্ষিতিমোহন সেন। কাশী।

## ছোটোদের বলছি

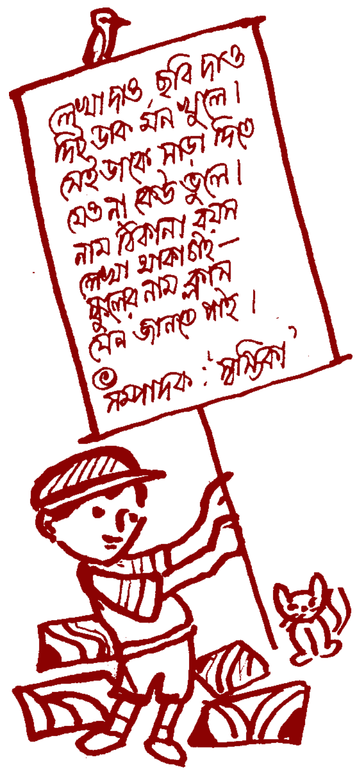


## উ ল টো পা ল টা

জয় সিং পাঞ্জাবি। সে ট্যাক্সি চালায়। ভালো বাংলা বলে। কোনও যাত্রীকে ফেরায় না। রাতেবিরেতে ডাকলে সাড়া দেয়! গাড়ির অভাবে বিপদে পড়া মানুষকে সাহায্যের জন্যে সবসময় তৈরি। সেদিন একটু তাড়া থাকায় জোরে চালাচ্ছিল। পুলিশ থামাল। কলকাতার পুলিশের সৌজন্য কম। চোখ রাঙানিতে পটু। বলল, 'সামনে স্কুল। আস্তে চালাও' লেখা আছে! মানোনি কেন?' জয় হেসে বলল, 'লেখা আছে ঠিকই। তবে এখন স্কুল ছুটি।'

।। ২।।

পঞ্চানন নন্দী শেখের বাজারে মাছের ব্যবসা করে। মাছের ব্যবসার সবরকম কৌশল পঞ্চানন জানে। খারাপ মাছকে ভালো বলে চালাতে পারে। আর খুব ভালো মাছ হলে চড়া দাম হাঁকে। কিছু বাঁধা খদ্দের আছে তার। গৌরাঙ্গ ডাক্তার রোজ মাছ কেনেন। তাঁকে দেখে পঞ্চু বা পঞ্চানন বলল, 'বাবু, ভালো মাছ আছে। নিয়ে যান। ঝাল করে খাবেন।'

গৌরাঙ্গ ডাক্তার বললেন, 'সেদিন তোমার কথামতো মাছ কিনে বাড়িতে দেদার গাল খেয়েছি।'

।। ৩।।

সিঁথির মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অধ্যাপক কুন্তল মিত্র।

পাশে এসে দাঁড়াল এক মাঝবয়সী লোক।

কুন্তল বললেন, 'অনেকক্ষণ বাদে বাস আসছে। ভিড়ে ভর্তি। উঠতে পারবেন?'

মাঝবয়সী লোকটি বলল, 'ভিড় বাসেই আমার কাজের সুবিধে।'

**রামগরুড় সংকলিত**

# একলা চল রে— কেবলই সঙ্গীত ?

**ইন্দিরা রায়**

পুরুষ ছাড়া নারী/বাঁচতে নারি— এমন কথাই প্রচলিত আমাদের সমাজে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী অবশ্যই পুরুষের অধীনস্থ এটাই মনে করা হয়। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে সে ছবি অনেক বদলে গেছে। এখন মেয়েরা অনেক স্বাধীন। আত্মনির্ভরশীল এবং জীবনে চলার পথে একলা জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত। কিন্তু একজন নারী যতই স্বাবলম্বী হয়ে আনন্দে দিন কাটিয়ে দিক না কেন, সমাজের চোখে সে কিন্তু নানা সমালোচনার বাণে জর্জরিত। অথচ নারী আজ কোনও অংশেই পিছিয়ে নেই— একথা শোনা যায় সাধারণ মানুষের মুখে। অগ্রসরমান প্রগতির যে পরাধীনতার শিকল ভেঙে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছে যার উজ্জ্বল বলিরেখার প্রভাবে মেয়েরাও অশিক্ষা কুসংস্কারের অন্ধকার গুহা থেকে ক্রমশ বেরিয়ে এসে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব ঘোষণা করতে সাহস পাচ্ছে। মেয়েমানুষের জন্মই পুরুষের ছত্রচ্ছায়ায় থাকার জন্য, পুরুষকে খুশি করার জন্য। মা-দিদিমাদের এই প্রবাদবাক্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এখনকার নারীর শিক্ষা জীবিকা এমনকি নিজেদের স্বাধীনতার প্রয়োজনে ড্যাং ড্যাং করে নিজের জীবন একাই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। যে দেশের মেয়ে বিরাট এক রাষ্ট্রকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখে, সে দেশের মেয়েরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ সম্মান পেতে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে লড়াই করে যায়, সেই দেশেরই একটি মেয়ে একা স্বাধীনভাবে থাকতে গেলে কেন পাড়াপ্রতিবেশীদের অহেতুক সন্দেহ ও বিরক্তির কারণ হয়, কেন দুরাত্মা সুবিধাবাদীদের লোভের শিকার হয়, কিংবা ভাই বা দেওরের সংসারে নিভৃতে কাঁদে?

আগের দিনের নারীর অবস্থান যে জায়গায় ছিল, সেই অসহায় কারারুদ্ধ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে আজকের মেয়েরা চাইছে— পুরুষ নামক বডিগার্ডকে পাশে না নিয়েও নিজের ব্যক্তিসত্তা বজায় রেখে একলাই জীবন কাটিয়ে যাবে। কিন্তু সে ব্যাপারেও মেয়েরা নিরাপদ নয়। নানা কটূক্তি, নানা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। শুধুমাত্র একা থাকার জন্য নয়, মেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে সুদূরে পাড়ি দিলেও হাজারো প্রশ্নের বাণ তাদের কানে আসে। এত দুর্গম পথে পুরুষ ছাড়া শুধু মহিলারা এলেন কী করে! কোনও পারিবারিক বা সাংসারিক জটিলতায় মহিলার তুলনায় পুরুষের সই ছাড়া সম্ভব নয়। মেয়েদের চলাফেরায় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। সবক্ষেত্রে পুরুষের সমান প্রমাণ করতে চাইলেও তাদের মনে রাখতে হবে, দৈহিক সৌষ্ঠবে তারা পুরুষদের থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু আজকের মহিলারা এটা মানতে চান না। তাঁরা সেসবকে তুচ্ছ করে নিজেদের 'একলাজীবন' কাটাতেই আগ্রহী। এককজীবন কাটানো মানেই যে 'নিঃসঙ্গ জীবন' তা কিন্তু নয়। এক্ষেত্রে আমরা এক অবিবাহিতা মহিলা পূর্ণিমা মুখার্জির কথা উল্লেখ করতে পারি। উনি পৈত্রিক টাকায় একটা বাড়ি কিনে একা থাকেন। বই পড়ে, গান শুনে, গান করে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়ে দেন। কখনই 'একা' আছেন— একথা মনে আনেন না। তবে কিনা একদিকে স্বাধীনচেতা প্রতিবাদী মহিলাদের আবার কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যদিও সেটা প্রবীণাদের ক্ষেত্রে ততটা নয়, যতটা অল্পবয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ যেসব একক নারী স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খল পথে পা বাড়ায়, পোশাক-আশাকে অশালীনতা থাকে, সেক্ষেত্রে পুরুষ ছাড়া জীবন কাটানোর কথা বললেও পুরুষের থাবার শিকার হন তারা। এটা কিন্তু নারীসত্তার অপলাপ। একথা বলতেই হয় যে, একক নারীর সুবিধা-অসুবিধা দুটোই নির্ভর করে তার ব্যক্তিসত্তা ও পরিবেশ মানিয়ে চলার ওপর। ▯


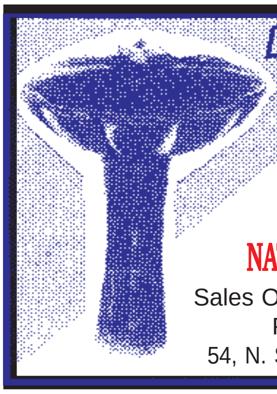
Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

# দিল্লীতে সি পি এমের এ কে গোপালন ভবনে ‘বিপ্লব’

**অজিত কুমার বিশ্বাস**॥ প্রসেনজিৎ বসু বামপন্থী মহলে খুব পরিচিত নাম। তিনি সিপিএমের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ‘এ কে গোপালান’ ভবনে তাত্ত্বিক মুখপাত্র ছিলেন অনেক বছর ধরে। কলকাতারই ছেলে। পড়াশোনা করেছেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (JNU)। কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করে ১৯৬৯ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আড়ালে কমিউনিস্ট তৈরি করার কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখান থেকেই তৈরি হয়েছে এস এফ আই-এর নেতারা তারপর সিপিএমের। এখান থেকেই তৈরি হয়েছে সিপিএমের জেনারেল সেক্রেটারি প্রকাশ কারাত, পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়াচুরি। এখানেই শেষ নয়। নেপালের মাওবাদী নেতা ‘প্রচণ্ড’ এখানকারই ফসল। এই ‘প্রচণ্ড’ই নেপালে রাজাকে হটিয়ে বিশ্বের একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্রের পতন ঘটিয়ে আর একটি ‘পশ্চিমবঙ্গ’ বানাবার চেষ্টা করছেন। সেই জে এন ইউ-তে ‘বিপ্লব’।

এস এফ আই বিরোধিতা করেছে সিপিএমের। আসলে সিপিএম- কংগ্রেস একই বৃন্তের দুটি ফুল।

সিপিএমের প্রণববাবুকে সমর্থন করার প্রতিবাদে প্রসেনজিৎ বসু যে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন তা কমিউনিস্ট লিটারেচারের এক বিশিষ্ট দলিল হয়ে যে থাকবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কলকাতার কোনও কাগজ তা ছাপেনি কারণ হয়তো সিপিএমের সন্ত্রাসের ভয় এখনও কাটেনি অনেকের মনে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী প্রণব মুখোপাধ্যায়-কে সিপিএমের সমর্থন একটা কৌশলগত অবস্থান। এই সমর্থনের ফলে কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেসের ভিতরকার দ্বন্দ্বকে আরও উসকে দেওয়া যাবে। উভয়ের ভিতর দূরত্ব রচিত হলে লাভবান হবে সিপিএম। সিপিএম আবার ক্ষমতা লাভের স্বপ্ন দেখছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসকে যদি কংগ্রেস থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তা হলেই ক্ষমতা লাভ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের এক বছরের কার্যকলাপে জনগণের একটা অংশ কিছুটা ক্ষুব্ধ। ভুলে গেলে চলবে না সিপিএমের প্রায় ৩৪ বছরের রাজত্বকালের কথা। প্রসেনজিৎ বসুর সিপিএম থেকে পদত্যাগ কমিউনিস্ট নেতাদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

*প্রসেনজিৎ বসু*

তাদের তৈরি জে এন ইউ-রূপী কমিউনিস্ট তৈরির কারখানায় যে প্রসেনজিৎ তৈরি হলো তাঁর এই পদক্ষেপ কংগ্রেসকেও চিন্তায় ফেলেছে।

প্রসেনজিতের চার পাতার চিঠি আর এক বামপন্থী পত্রিকা ‘Mainstream’-এ ৫ জুন প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পয়েন্ট প্রসেনজিৎবাবু যা তুলেছেন তা হচ্ছে ২০তম সিপিএম পার্টি কংগ্রেসে যে রাজনৈতিক লাইন নির্দেশ করা হয়েছে, পলিটব্যুরো প্রণববাবুকে সমর্থন জানিয়ে সে লাইন সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করেছে। জেনে-শুনে করেছে। তাঁর মতে সব পলিটব্যুরো মেম্বারের শাস্তি হওয়া উচিত। তা তো হলো না।

সিপিএমের বক্তব্য যে প্রণববাবুকে ভোট দিলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা খুব খুশি হবে এবং কংগ্রেস ও তৃণমূলের বিভাজন খুবই তীব্র হবে। তাতে জোট ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসেনজিৎবাবু প্রণববাবুর রাজনৈতিক জীবনের পর্যালোচনা করেছেন। পার্টি বলেছে প্রণববাবুর আজ রাজনৈতিক মহলে ‘widest acceptance’ আছে। প্রসেনজিৎবাবুর বক্তব্য— তিনি একমাত্র অর্থমন্ত্রী যাঁর আমলে এক দশকের ওপর খাদ্যদ্রব্যের ‘inflation’ দু’ ডিজিট সংখ্যার উপর চলেছে এবং সে ব্যাপারে উনি কোনও সার্থক নীতি নির্ধারণ করে মূল্যবৃদ্ধি রোখার কোনও প্রচেষ্টাই করেননি। প্রণববাবু উদার বাজারি অর্থনীতির পূর্ণ সমর্থক সেই ১৯৯১ সাল থেকে। যার ফলে ভারতের দরিদ্র জনসাধারণ inflation ও পরোক্ষকর ভারে জর্জরিত। সিপিএম ভাবছে বাঙালি এম এল এ এবং এম পি-রা বাঙালি মানসিকতার বশবর্তী হয়ে প্রণববাবুকে ভোট দেবেন। দলকে একেবারে ‘আমরা বাঙালি’ দলে পর্যবসিত করা হচ্ছে।

পলিটব্যুরোর ‘নয়নের মণি’ প্রসেনজিতবাবু আরও লিখছেন— ‘The Party leadership has committed one mistake after another since 2007 coercive land acquisition in West Bengal, the Nandigram police firing, allowing the UPA Government to a approach IAEA with the nuclear deal...”

আমাদের প্রশ্ন, ২০০৭-এর আগের সিপিএম ভ্রষ্টাচার, জনগণের ওপর অত্যাচার, জনবিরোধী স্থানীয় প্রশাসনিক নীতি, স্বজনপোষণ, পুলিশের আর হার্মাদদের অত্যাচার তিনি কি জানতেন না? বামফ্রন্ট আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অরাজকতা চলেছে ৩৪ বছরে বামপন্থী অধ্যাপক ছাড়া কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ উপাচার্য হতে পারেনি তা কি তিনি জানতেন না?

আজকে পশ্চিমবাংলার মানুষ কি ভুলে যাবে ১৯৭৭ থেকে ২০১০-এর মধ্যে সিপিএম ৫৫, ৬১৯টি রাজনৈতিক হত্যা করেছিল। সর্বত্র বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নিজেদের প্রতিপত্তি বহাল রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম গণধর্ষণকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৭৮ থেকে ২০১০-এর ভেতর ৭২,৬০০ নারীকে গণধর্ষণের শিকার হতে হয়েছিল। প্রসেনজিৎবাবু কি জানতেন না যে ভোট রিগিং এক নতুন পর্যায়ের রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে বিগত ৩৪ বছরের রাজত্বে সিপিএম ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াকে এক প্রহসনে পরিণত করেছিল। তখন এইসব অপরাধমূলক ক্রিয়াকর্ম ছিল শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার।

গত ৩৪ বছর ধরে জে এন ইউ যে ‘ভেড়ার’ দল তৈরি করেছে, তাদের মধ্য থেকে প্রসেনজিৎবাবু সিপিএম পার্টির মতো আদর্শহীন ও ক্ষমতালোলুপ ঘৃণ্য দল ত্যাগ করে খুব ভাল কাজ করেছেন। আজ প্রয়োজন আছে গত ৩৪ বছরের অত্যাচারের ইতিহাস লিখে রাখা। এইসব বর্বরদের বিচার চাই। এখন সাবধান হতে হবে কেননা এরাই ‘লাল’ জার্সি ছেড়ে নানা রং-এর জার্সি পরছে, নানা দলে যাচ্ছে। এই সিপিএম যেন বিরোধী দলের স্বীকৃতিও না পায়। বিরোধী দলেও বাংলার স্বার্থে চাই দেশাত্মবোধ সম্পন্ন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল।

শুধু শাসকদল পাল্টালেই চলবে না। স্বীকৃত বিরোধী দলও সরকারের অঙ্গ। তাই স্বীকৃত বিরোধী দল থেকেও আজ সিপিএম-কে হটাতে হবে। তবেই বাংলায় সত্যিকার পরিবর্তন আসবে। ❑

# গান্ধী-নেহরু-যোগেন-জ্যোতি-সুরাবর্দী আর মমতা
# হিন্দুর ক্ষতিসাধনে কার বেশি ক্ষমতা?

**শিবাজী গুপ্ত**

প্রশ্নটা আজকাল অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনকেই নাড়া দিচ্ছে। বিগত নেতারা আমাদের কত ক্ষতিসাধন করেছেন, আর আগত নেতারা আমাদের জাতি, ধর্ম ও রাষ্ট্রের কত ক্ষতিসাধন করবেন সেটাই চিন্তার বিষয়।

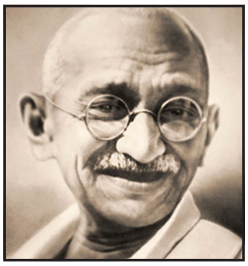
গান্ধী

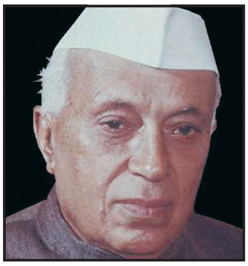
নেহরু

যোগেন

জ্যোতি

সুরাবর্দী

মমতা

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারি নীতির ধারা অবলম্বনপূর্বক 'বিসমিল্লা-হির-রাহমান রহিম' বলেই শুরু করা যাক। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর আমবাগানে পাঁচশতাধিক বছরের ইসলামী শাসনের রাহুগ্রস্ত থেকে বাঙালি হিন্দুর মুক্তিলাভ ঘটে। কিন্তু ১৯০৫ সালে বাংলাভাগ মারফত সরকার হিন্দুর কোমর ভাঙার ব্যবস্থা করে। হিন্দুর ক্ষাত্রতেজে অতিষ্ঠ হয়ে ভাঙা বাংলাকে জোড়া দিল বটে, কিন্তু বাংলাভাষী কিছু এলাকা অসম ও বিহারের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে বাংলার শাসনভার মুসলমানদের হাতে তুলে দেবার পথ খোলা রাখল। আর ১৯১৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কারের মাধ্যমে সরকার মুসলমানদের জন্য আলাদা নির্বাচন এবং সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। এভাবে হিন্দু-মুসলমানে বিভাজনের পথ পরিষ্কার হলো। হিন্দুর চেঁচামেচি করলেও মুসলমানরা এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাল।

১৯৩২ সালে গান্ধী গেলেন বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে সারা ভারতের প্রতিনিধিত্বের ফাঁকা দাবি করে। গিয়ে দেখেন টেবিল গোল নয়--- অনেকখানি লম্বা। সেখানে মুসলমান, শিখ, পার্শী, দলিত ও রাজা মহারাজারা আলাদা আলাদা দাবি নিয়ে হাজির। গান্ধীকে কেউ নিজেদের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করল না। ইংরেজ এই সুযোগে হিন্দু সমাজকে জাত-গোত্রের ভিত্তিতে উন্নত ও অবনত— এই দুইশ্রেণীতে ভাগ করে আর ম্যাকডোনাল্ড এওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়োরার মাধ্যমে আইনসভায় অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে হিন্দুদের প্রাপ্য আসন কমিয়ে ও মুসলমানদের প্রাপ্য আসন বাড়িয়ে দিয়ে বাংলাকে চিরস্থায়ীভাবে মুসলিম শাসনে আবদ্ধ থাকার ব্যবস্থা করে। রাজনৈতিকভাবে বাংলার হিন্দুকে পঙ্গু করার এই জিঘাংসামূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য না করে গান্ধী দলিত নেতাদের অতিরিক্ত আসন ঘুষ দিয়ে পুণা চুক্তি সম্পাদন করলেন। তাতে সাধারণ হিন্দুসমাজ আরও দুর্বল হলো, কিন্তু দলিত হিন্দুরা মানসিকভাবে দূরেই রয়ে গেল। বৃটিশের পর গান্ধীর ব্যবস্থাপনায় বাংলার হিন্দুরা আরও গুরুত্বহীন হয়ে গেল।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে যুক্তভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করে হিন্দুদের সম্মান ও স্বার্থ রক্ষার কিঞ্চিৎ সুযোগ এলেও গান্ধী সে প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দিয়ে বাংলার হিন্দুদের বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করে ১৯৪৬ সালে মুসলীম লীগের সহজ শিকারে পরিণত করেন।

১৯৪৬ সালে সারা বাংলায় বিশেষ করে কলকাতা ও নোয়াখালীতে সুরাবর্দীর প্রত্যক্ষ সংগ্রামে হিন্দুদের ধন গেল প্রাণ গেল, মা-বোনের ইজ্জত গেল। গান্ধী কলকাতা এসে সুরাবর্দীকে কোলে করে বসে থাকলেন। নোয়াখালীতে পরিক্রমা করে মহান হলেন। হিন্দুরা বাস্তুচ্যুত হয়ে নতুন জাতি 'রিফিউজী' নামে পরিচিত হলো— আর তাঁর আদরের দুলাল ভ্রষ্টচরিত্র জহরলাল লেডি মাউন্টব্যাটেনের এ্যাপ্রণ ধরে দিল্লীর গদিতে বসলেন। গান্ধীর সারা জীবনের আশা পূর্ণ হলো।

১৯৫০ সালে সমগ্র পূর্ববঙ্গ/ পূর্বপাকিস্তানে হিন্দু বিরোধী গণহত্যায় বাঙালী হিন্দুর মেরুদণ্ড চিরতরে চুরমার হয়ে গেল। ভীত, দুর্বলচিত্ত ও মুসলমান-প্রেমী নেহরু

পাক-প্রধানমন্ত্রী শয়তানের প্রতিমূর্তি লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে খোস মেজাজে বৈঠক করলেন এবং বাঙালি হিন্দুর শ্মশানের উপর নেহরু-লিয়াকত চুক্তির ধ্বজা ওড়ালেন। হিন্দুর অন্তিম গতি হলো দণ্ডাকারণ্যে আন্দামানে।

১৯৭৭ সালে পাশার চাল উল্টোল। জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী ক্ষমতাচ্যুত হয়ে রাজনীতির মঞ্চ থেকে সরে গেল। ক্ষমতা দখল করল মুসলিম লীগের সহযোগী কম্যুনিস্টরা— যারা সম্পূর্ণ বাংলার পাকিস্তানভুক্তির জন্য জানপ্রাণ দিয়ে লড়েছিল। কিন্তু ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে হিন্দুনেতারা বৃটিশ, কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টদের অশুভ চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলার যে ক্ষুদ্রাংশ হিন্দুদের বসবাসের জন্য রক্ষা করেছিলেন তার শাসনভার পেয়ে গেল ভস্মাসুর কম্যুনিস্টরা। পেয়েই শুরু হলো তাদের পুরনো খেলা অর্থাৎ মুসলিম তোষণ, মুসলিম পোষণ। আর তা শুধু পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমান নয়, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদেরও তারা সাদরে স্বাগত জানাল। প্রত্যেকটি বিধানসভা কেন্দ্রে ২০/২৫ হাজার বাংলাদেশী মুসলমানকে জায়গা করে দিয়ে, ভোটার লিস্টে নাম ঢুকিয়ে, রেশনকার্ড পাইয়ে দিয়ে এবং ভারতীয় নাগরিক হিসাবে সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট দানের ব্যবস্থা করে তারা বিরাট ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করে ৩৪ বছর নির্বিবাদে রাজত্ব করল। কিন্তু রাষ্ট্রের ও বৃহত্তর হিন্দুসমাজের যে ক্ষতি করে গেল, তা নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। দেশ ভাগে পুরো বাংলা পাকিস্তানে না যাবার যে মনোবেদনা তারা ভুগতেন, তা প্রশমিত করার ব্যবস্থা করে গেলেন। আর ২০ বছর পরে বাংলায় একচ্ছত্র মুসলিম শাসন কায়েম হলে তার পুরো কৃতিত্ব সিপিএম ও জ্যোতিবাবুর দাবি করতে পারেন।

২০১১ সালে হিন্দুর সর্বনাশ শুধু নয়, সাড়ে-সর্বনাশ রূপে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে তৃণমূল নেত্রীর আবির্ভাব, কিন্তু আবির্ভাবের সূচনাতেই হিন্দুদের সুখশান্তি বিনাশের সূত্রপাত হলো বলা যায়। সিপিএমের চৌত্রিশ বছর ব্যাপী জগদ্দল পাথর বুক থেকে নেমেছে, গলার ফাঁস কেটেছে অস্বীকার করা যাবে না ঠিকই, কিন্তু সিপিএমের অসমাপ্ত কাজের ভার যেন তৃণমূল নেত্রীর হাতে দিয়ে গেছে। সিপিএম মুসলমানদের পাশে স্থান দিয়েছিল ঠিকই; কিন্তু নেত্রী তাদের কোলে তুলে নিয়েছেন একেবারে। বিসমিল্লা বলে নেত্রীর দিন শুরু আর ইনশাল্লা বলে শয্যাগ্রহণ। তার শাসনে মুসলমানরা সাপের পাঁচ পা দেখেছে। নেত্রীর শাসনে তাদের সাতখুন মাপ। সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী চলছে হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার।

অবিভক্ত বাংলায় কুখ্যাত সুরাবর্দী শাসনের পর খণ্ডিত বাংলায় হিন্দুরা আর কখনও এমন পড়ে পড়ে মার খায়নি। সিপিএমের রোপিত বিষবৃক্ষে সার জল দিয়ে নেত্রী বিষফল ফলাচ্ছেন, হিন্দুরা সে বিষফল ভক্ষণ করে ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করছে। তাদের ধনপ্রাণ মান ইজ্জত বাংলাদেশের হিন্দুদের চেয়েও অধিকতর বিপন্ন। তাহলে হিন্দুর ক্ষতিসাধনে কার অবদান বেশি পাঠক বিচার করুন। ☐


## যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

**Ori Plast**

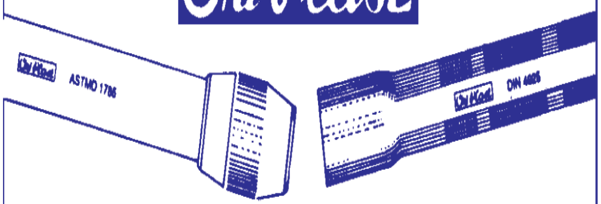


**P.V.C. Threaded Pipes.** For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

***Authrorised Distributor :***

**NATIONAL PIPE & SANITERY STORES**

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

**PARTHA SARATHI CERAMICS**

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

# মাওবাদীরা দেশের জঘন্যতম শত্রু

মাওবাদীদের হালকা ভাবে দেখা উচিত নয়। তাদের একইরকম ভাবে বার্তা দেওয়া উচিত যে, তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রশাসন যথোপযুক্ত ভাবে মোকাবিলা করবে।

ছত্তিশগড়ের সুকনা-র কালেক্টর অ্যালেক্স পল মেননকে উদ্ধারকার্যে মধ্যস্থকারী হিসেবে কাজ করেছিল বি ডি শর্মা। তাঁর মতে, সরকার ও মাওবাদীদের মধ্যে সংঘাত কেবল জঙ্গলে সুকনার কালেক্টরের অপহরণ বা তাঁর মুক্তির মধ্যে দিয়ে শেষ হবে না। মনে হয়, মার্কসবাদী বা মাওবাদীরা নির্ভয়ে কোনও কিছু অপহরণ করতে পারে শাস্তি বা তার পরিণামকে আমল না দিয়েই।

শর্মার মতে এই লড়াইয়ের মূলে রয়েছে জনজাতিদের জল, জঙ্গল এবং মাটির অধিকারের লড়াই। অবশ্য এটাই সব নয়। ভারতীয় কম্যুনিস্টদের একাংশ জনজাতিদের অভাব-অভিযোগ, তাদের প্রতি সামাজিক অবিচারকে সামনে রেখে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চায়। এইসব গুণ্ডারা আধুনিক সময় থেকে একশ' বছর পিছিয়ে রয়েছে। এরা মনে করে মাওবাদ-ই শেষ কথা আর ব্যাপক সন্ত্রাস এবং নির্দয় হত্যার মাধ্যমেই বর্তমান শাসককুলকে তাদের পদানত করা যাবে।

এরা বুঝতে পারছে না যে, মাও সশস্ত্র বিপ্লবে সফল হয়েছিল তখন যখন চীনের সমাজ দ্বিধা-বিভক্ত এবং চরম বিশৃঙ্খলা চলছিল। মাও নিজেকে লেনিন, স্ট্যালিনের মতোই নির্দয় ঘাতক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বিশেষত স্ট্যালিন ছিলেন কম্যুনিস্ট আন্দোলনের জনক। এই ত্রয়ী লক্ষ লক্ষ মানুষের হত্যাকারী হিসেবে ইতিহাসে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দান্তেওয়াড়ায় মাও আক্রমণে নিহত জওয়ানেরা। (ফাইল চিত্র)

"বিপ্লব, যা মাওবাদীরা বলে থাকে তা কেবল অতীত হয়ে গেছে শুধু নয়, বরং লোকসমাজে আজ নিষ্ঠুর বিদ্রূপে পরিণত। মাওবাদীদের সামনে এই বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা উচিত। সবচেয়ে বড় কথা হলো, কম্যুনিজম বিদেশী তত্ত্ব আর আজ এই তত্ত্ব দুনিয়ায় অচল।"

## অতিথি কলম

এম ভি কামাথ

বিপ্লব, যা মাওবাদীরা বলে থাকে তা কেবল অতীত হয়ে গেছে শুধু নয়, বরং লোকসমাজে আজ নিষ্ঠুর বিদ্রূপে পরিণত। মাওবাদীদের সামনে এই বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা উচিত। সবচেয়ে বড় কথা হলো, কম্যুনিজম বিদেশী তত্ত্ব আর আজ এই তত্ত্ব দুনিয়ায় অচল। দ্বিতীয়ত, বিশশতকের প্রথম দিকে ভারতীয়রা ইতিহাস থেকে শিখেছে যে, জনজাতিদের সামাজিক সমস্যাগুলি কীভাবে সমাধান করতে হয় তার উপায়। এই সমস্যাগুলি মূলত জনজাতিদের বন এবং বনজসম্পদ, জমির অধিকার, ব্যবসায়ী ঠিকাদার রাজনীতিবাদের অশুভ আঁতাতকে ঘিরে।

দুর্ভাগ্যের কথা, মার্কিন মুলুকে সেই অষ্টাদশ শতকে সাদা চামড়ার লোকজন নেটিভদের জমি-জমা জবরদখল করে ভারতীয়দের শেখালো কীভাবে জনজাতিদের ভিটে-মাটি ছাড়া করতে হয়। ঠিক একইভাবে এদেশে ফড়েদের মধ্যে এমন প্রবণতা দেখা গেল। এদেশের জমি দেশের কোনও ব্যক্তির মালিকানায় নয়, আর এটাই জনজাতিদের মধ্যে সমস্যা তৈরি করলো। কোনও সরকার কি যথেচ্ছভাবে জনজাতিদের পিতৃপুরুষদের জমি থেকে উৎখাত করতে পারে?

সমস্যা তৈরি হলো যখন সরকার কেবল অর্থনৈতিক কারণেই জনজাতিদের শত শত বছরের অধিকৃত ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত করতে চাইলো। এদের উৎখাত করে সেই জমিতে বাঁধ নির্মাণ বা খনিজ সম্পদ সন্ধানে প্রচেষ্টা শুরু হতেই বিবাদ তৈরি হলো সরকার ও জনজাতিদের মধ্যে। প্রশ্ন হলো, বৃহত্তর

জাতীয় স্বার্থে কোন্‌টা অগ্রাধিকার পাবে?

মাঝেমধ্যে ভারতীয় সমাজের কিছু ধান্ধাবাজ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অনৈতিকভাবে খনি খনন শুরু করলো আর এই প্রচেষ্টাই তৈরি করলো জমির আইনি অধিকার সংরক্ষণের বৈধতার প্রশ্ন। পাটোয়ারী এবং দারোগা হাতে হাত মিলিয়ে আইনকে বুড়ো-আঙুল দেখিয়ে কাজ শুরু করতেই সন্দেহ দানা বাঁধলো।

একদিকে জবরদখলদারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলো। অন্যত্র আবার ১৯৯৬-তে তৈরি হওয়া ভুরিয়া কমিটির সুপারিশ মেনে জনজাতিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলো। খনি উৎখননের লক্ষ্যে এবং এই সুপারিশক্রমে জনজাতিদের শিল্পে অংশীদারিত্ব আয় তাদের আর্থিক অবস্থাকে সুস্থিতি করতে আরও কিছু পদক্ষেপ করা হলো যা জনজাতিরা আগে কখনওই স্বপ্নেও ভাবেনি।

সভ্য সামাজিক মানুষ হিসেবে আমাদের আচরণ করা উচিত। অতীতে রেড ইন্ডিয়ানদের ওপর যেভাবে ইউরোপীয় অনুপ্রবেশকারীরা অত্যাচার চালিয়ে ভূমিহীন করেছে তেমনভাবে নয়।

ইতিমধ্যে লক্ষ্য রাখতে হবে কম্যুনিস্ট জবরদখলকারীরা এই সুযোগে ঢুকে পড়ে তাদের ব্রাত্য নীতির মাধ্যমে দিল্লীতে মাওবাদী শাসন কায়েম করতে না পারে। কেন্দ্র দাবি করতে পারে যে, সরকারের সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে গত তিন বছরে যে কাজ শুরু হয়েছে তা জনজাতিদের মধ্যে সরকারের প্রতি যে অবিশ্বাসের আবহ তৈরি হয়েছে তা দূর করবে। এই প্রকল্পের ৭৮টি নকশাল অধ্যুষিত জেলাসমূহের ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। যোজনা কমিশনের সদস্য মিহির শাহর মতে ৩৫০০ কোটি টাকার প্রকল্পে যোগ্য ব্যক্তিদের স্থান হয়নি। তাঁর মতে, এই প্রকল্পে যদি স্থানীয় জনজাতি এবং তৃতীয় পক্ষ হিসেবে সিভিল সোসাইটির লোকজনদের তদারকির কাজে যুক্ত না করা হয় তবে এই প্রকল্প ব্যর্থ হবে।

অদ্যাবধি অন্ধ্রপ্রদেশের ৮টি জেলা, বিহারের ৯টি, ছত্তিশগড়ের ১০টি, ঝাড়খন্ডের ১৭টি, মধ্যপ্রদেশের ৮টি, মহারাষ্ট্রের ২টি, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের যথাক্রমে ১৯ ও ৩টি জেলা এই প্রকল্পের অধীনে। এইসব অঞ্চলে ভাল রাস্তা, অঙ্গনবাড়ির মাধ্যমে বিদ্যালয়, চিকিৎসা কেন্দ্র, পানীয় জলের ৬৪০০ প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সমালোচকরা বলছে এসব লোক দেখানো। এদের মতে অধিকাংশ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে লোক নেই। স্কুলগুলিতে প্রশিক্ষিত শিক্ষক নেই।

শাহ্ বলতে চাইছে যে এই অর্থ ব্যাপকহারে না বিলিয়ে বরং নকশাল অধ্যুষিত দরিদ্রতম, বঞ্চিত মানুষদের স্বার্থে ব্যয় হোক।

কিন্তু যেসব মাওবাদীরা এযাবৎ ২৬০৪ জন মানুষকে হত্যা করেছে তাদের হাল্কাভাবে নিলে চলবে না। কিন্তু কেন্দ্রের দুর্বল সরকার কি মানব অধিকার লঙ্ঘনের ভয়ে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে? মাওবাদীরা কখনও-ই মানব অধিকারকে আমল দেয়নি। এদের আইকন যদি 'মাও' হয় তবে এরা ভারতীয় নয়। ভুরিয়া কমিটি আর্থিক উন্নয়নের কথা বললেও মাও-সমস্যা সমাধানে চুপচাপ। মাওবাদীরা গৃহযুদ্ধ চায়, এদের বিষয়গুলি মোটেই খাটো করে দেখা উচিত নয়। মাওবাদীদের কার্যকলাপ বেআইনি ঘোষণা করলেই শুধু হবে না, সরকারের উচিত এদের সমূলে উৎপাটন করা। লজ্জার বিষয় যে, কিছু নকশাল অধ্যুষিত জেলায় সরকার অকেজো। এইভাবেই কি আমরা ইউ পি এ সরকারকে মনে রাখবো?

□


নেত্রদান মহাদান

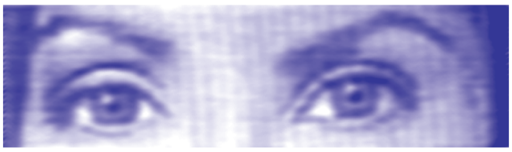

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান : 22181995, 22180387

সৌজন্যে : কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

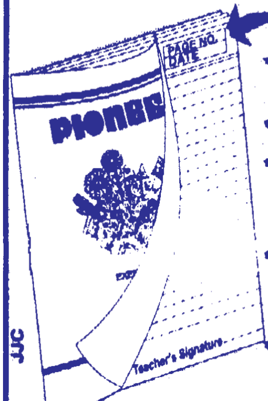

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature........................ কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

# সোনিয়ার কৃপায় কেরল সরকারকেই গ্রাস করে ফেলেছে মুসলিম লিগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** কেরলের কংগ্রেস-মুসলিম লিগ সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন মন্ত্রী এম কে মুন্সীর কৌশলে তাঁর পিতা মহম্মদ কয়ার নামাঙ্কিত একটি ট্রাস্টে পঞ্চায়েত মিউনিসিপালিটি করপোরেশনগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে এক লক্ষ থেকে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত দান করার সরকারি ফতোয়া জারি করেছেন। উল্লেখ্য, ওই ট্রাস্টটি সম্পূর্ণভাবে

*অচ্যুতানন্দ*

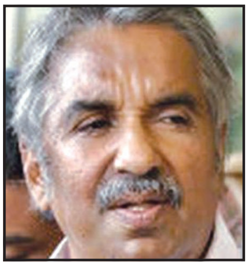

*ওমেন চণ্ডী*

*ভেলাপাল্লী নাতেসন*

মুসলিম লিগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সংবাদসূত্র অনুযায়ী ট্রাস্টের সংগৃহীত ওই টাকা কেরলের মালাবার অঞ্চলের ৩৫টি মাদ্রাসাকে একযোগে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে রূপান্তরের জন্যই বরাদ্দ করা হবে।

উল্লেখ্য, ওই ৩৫টি স্কুল শুরুতে কেন্দ্রীয় অনুদানপ্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘুদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যেই শুরু করা হয়েছিল। এগুলির উদ্যোক্তা ছিল মুসলিম লিগ ও অন্যান্য মুসলিম সংগঠন। এই স্কুলগুলির জমি, বাড়ি ও অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নের যাবতীয় খরচই কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেছিল। এই প্রসঙ্গে কেরল সরকারের এক সাম্প্রতিক ওয়েব প্রচারের সুবাদে জানা গেছে, স্কুলগুলি কেরল সরকার অধিগ্রহণ করেছে। বিধানসভায় বিরোধী সিপিএম সদস্যের এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারের বিদ্যালয়গুলিকে সরাসরি অধিগ্রহণের পরিকল্পনাই রয়েছে অথচ মুসলিম লিগের মন্ত্রী আব্দুল রাব জানাচ্ছেন, অধিগ্রহণ নয় বিদ্যালয়গুলি থাকবে সরকারি অনুদানপ্রাপ্তের তালিকায়।

**অধিগ্রহণ আর অনুদানপ্রাপ্ত :**

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার স্কুলগুলিকে অধিগ্রহণ করলে সেখানকার জমির মালিকানা থেকে শুরু করে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিই সরকারের উপর বর্তাবে। সব থেকে বড় কথা এ ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের অধিকারটিও থাকবে পুরোপুরি সরকারের হাতে। অন্যদিকে সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির বাৎসরিক ৫০ কোটি টাকার আর্থিক অনুদান এই ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের নেতাদের হস্তগত হওয়া এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকায় তাদের পক্ষে টাকা রোজগারের রাস্তাটা পাকা হবে।

সম্প্রতি হিন্দুদের স্বনিযুক্ত পরিত্রাতা ক্ষমতাহীন সিপিএম এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার পরিকল্পনা নিয়েছে। একই সঙ্গে আর এস এস, বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ একযোগে এই বিপজ্জনক প্রবণতার বিরুদ্ধে বিশাল প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করছে।

**মুখ্যমন্ত্রীর মতলব :**

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ওমেন চণ্ডীর মুসলিম লীগের সহায়তায় নিজের গদি টিকিয়ে রাখার এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে হিন্দুদের ক্ষোভকে সংহত করতে কেরলের নায়ার সার্ভিস সোসাইটি (এন এস এস) ও শ্রী নারায়ণ ধর্ম পরিপালা যোগস (এস এন ডি পি)— যেগুলি নায়ার ও এজাভা হিন্দুদের শক্তিশালী গোষ্ঠী বলে মনে করা হয়, তারা পরস্পর হাত মিলিয়েছে। জঘন্য মুসলিম তোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এই ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত।

**হিন্দু অবস্থান :**

গত জুন মাসের শেষাশেষি এন এস এস ও এস এন ডি পি-র দুই সাধারণ সম্পাদক নিজেদের মধ্যে ফোনালাপের মাধ্যমে এই যৌথ হিন্দু আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করেছেন। তাঁদের মত অনুযায়ী এই কৌশল সংবেদনশীল সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ওপর বড় প্রভাব ফেলবে। এই সূত্রে মালাবার অঞ্চলে সামাজিক ন্যায়ের ধারণাটিকে যে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হচ্ছে তার প্রমাণ স্বরূপ মুসলিম সম্প্রদায়ের একতরফা উন্নয়নের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তাঁরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানান।

এন এস এস এবং এস এন ডি পি-র তরফে মুসলিম লীগের সীমাহীন ঔদ্ধত্য প্রকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে হিন্দুদের ভোট পেয়ে জিতে এসে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ওপরই আঘাত হানছে যা অগণতান্ত্রিক ও কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

মজার কথা হলো, ব্যক্তিগতভাবে বহু কংগ্রেস নেতা এবং ইউ ডি এফ-এর অন্যান্য সহযোগী নেতারাও ওমেন চণ্ডীর এই প্রকাশ্য মুসলিম তোষণে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী এমন একটি সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চণ্ডী ইউ পি সি সি এবং ইউ ডি এফ-এর সদস্য দলগুলির সঙ্গে কোনও আলোচনাই করেননি। এই পরিস্থিতিতে দুই শক্তিশালী হিন্দু সংগঠন এন এস এস ও এস এন ডি পি-র হিন্দু ঐক্যের

ডাকে পরস্পরের কাছে আসাটা অত্যন্ত ইতিবাচক সংকেত।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস পরিচালিত ইউ ডি এফ সরকারকে মুসলিম লীগের এমন অনায়াসে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে ফেলা নিয়ে কেরলে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন দানা বাঁধছে। বিশেষ করে রাজ্যের শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে একজন মুসলিম মন্ত্রী যেভাবে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তা মানুষ মোটেই ভাল চোখে দেখছেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুসলিম লীগই কংগ্রেসের জোট সরকারে দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক। গত ২৬ জুন ওই ৩৫টি স্কুলের বিষয়ে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী কোনও চূড়ান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ার কথা বললেও হঠাৎই লীগের প্ররোচনায় বা হুমকিতে আক্ষরিক অর্থেই রাতারাতি মত বদলে মুসলিম গরিষ্ঠ মালাবার অঞ্চলের মালাপ্পুরম জেলার বিতর্কিত স্কুলগুলিকে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল হিসেবে চিহ্নিত করার কথা ঘোষণা করেন।

**প্রতিবাদের রূপরেখা :**

মুখ্যমন্ত্রীর এই রাতারাতি ডিগবাজী খাওয়াকে সিপিএম নেতৃত্বাধীন এল ডি এফ অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যা দিয়ে এর বিরোধিতা করেছে। এই প্রসঙ্গে বিরোধী নেতা ভি এস অচ্যুতানন্দন কেরলে কতজন মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন বলে বিদ্রুপ করেছেন। ওদিকে হিন্দু এজাভা সংগঠনের মুখপাত্র এস এন ডি পি-র ভেলাপল্লী নাতেসন লিগের বিরুদ্ধে নাগরিক সম্পদ তছনছ করার অভিযোগ এনেছেন।

হিন্দু সংগঠন এন এস এস-এর সম্পাদক সুকুমারন নায়ার একধাপ এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর ও রাজ্য মন্ত্রণালয়ের অফিস মুসলিম লিগের শক্তঘাঁটি মাল্লাপুরমে স্থানান্তরিত করার মতো চরম বিদ্রুপাত্মক বক্তব্য পেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ২৭ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর ডিগবাজীর ঘটনার প্রতিবাদে বিরোধী নেতা অচ্যুতানন্দন বিধানসভা থেকে ওয়াক আউট করার আগে তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন, মুসলিম লীগ এক ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে স্কুলগুলিকে কুক্ষিগত করে দল সংশ্লিষ্ট পেটোয়া লোকেদের হাতেই তুলে দিতে চায়। এর ফলে দুর্নীতিকে চিরস্থায়ী করা যাবে।

**রাজ্য সভাপতির আশঙ্কা :**

বলার কথা, রাজ্য কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ও তাদের ছাত্র সংগঠনও এই প্রস্তাবের বিপক্ষে খোলাখুলি বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ইউ পি সি সি-র সভাপতি রমেশ চেন্নিথালাও কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ প্রকল্প হিসেবে চালু থাকা এই ৩৫টি স্কুলকে সরাসরি রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে রূপান্তরিত করার দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। শ্রী চেন্নিথালা তাঁর এই বিরোধী অবস্থানের কথা মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি জানিয়ে দেওয়ায় তিনি বেশ বিপাকে পড়েছেন।

সংবাদ সূত্র অনুযায়ী, কেরল কংগ্রেস প্রধান আশঙ্কা জানিয়ে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে ব্যাপক সামাজিক মেরুকরণের পক্ষ প্রশস্ত করবে। এবং সেই সম্ভাব্য বিস্ফোরক পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা যৌথভাবে জোট মন্ত্রিসভার তো নেই-ই, এককভাবে কংগ্রেস বা মুসলীম লীগ কারুরই নেই। এত বড় একটা সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত বিন্দুমাত্র আলাপ-আলোচনা ছাড়াই ছাড়পত্র পেয়ে যাওয়ায় তিনি যারপরনাই বিরক্ত।

এই প্রসঙ্গে চেন্নিথালা আরও বলেন গত ১৩ জুনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই ধরনের সিদ্ধান্তের আইনী বৈধতা ও সরকারের ওপর সম্ভাব্য বাড়তি খরচের বোঝা চেপে যাওয়ার মতো পাঁচ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অর্থমন্ত্রক তাদের নিশ্চিত আপত্তি জানায়। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে প্রস্তাবটি পাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। এই সিদ্ধান্তে ৫২ কোটি টাকা (আগের কিছু অর্থবর্ষের বকেয়া ধরে (Retrospective)) মহার্ঘ্য ভাতা হিসেবে কর্মচারীদের পাওনা হবে যা তাদের পি এফ (প্রভিডেন্ট ফান্ড) অ্যাকাউন্টে জমা হবে।

**মুসলিম লীগের দরকার :**

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে মুসলিম লীগের নেতা পি কে কুনাহালিকুট্টি তড়িঘড়ি চেন্নিথালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন। আনন্দের কথা চেন্নিথালা টলেননি। তিনি জানান মাদ্রাসাগুলিকে অনুদানপ্রাপ্ত করে দিতে তাঁর বিশেষ আপত্তি নেই, তবে সে ক্ষেত্রে অন্যান্য সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলিকেও একই ধরনের সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সমদর্শিতা অত্যন্ত জরুরি।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা চেন্নিথালার এই দৃঢ় ও ন্যায়সঙ্গত অবস্থানের পরিণতিতে সরকারের পক্ষে এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়বে। এই বিতর্কিত সিদ্ধান্তকে নিয়ে এত ব্যাপক ক্ষোভ-বিক্ষোভ, তর্ক-বিতর্ক চলবে যা সামাল দেওয়া সরকারের পক্ষে সোজা হবে না।

**ওমেন চন্ডীর হঠকারিতা :**

ইতিমধ্যে এন এস এস-এর সম্পাদক সুকুমারন নায়ার তীব্র ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন, এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এটা পরিষ্কার যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রশাসনের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন। তাঁর এই কু-সিদ্ধান্তের ফলে তিনি সমগ্র কেরলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক ভারসাম্যের স্থিতি নষ্ট করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। কেরলে শান্তি সংহতির বাতাবরণ ফিরিয়ে আনতে এই হঠকারী সিদ্ধান্ত বাতিল করে বিদ্যালয়গুলিকে পুরোপুরি সরকারি অধিগৃহীত করা ব্যতীত অন্য বিকল্প রাস্তা তাঁরা মেনে নেবেন না।

বিস্ময় ব্যক্ত করে তিনি আরও বলেন, ঘটনা পরম্পরা থেকে পরিষ্কার যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের দলকে পর্যন্ত অন্ধকারে রেখে কেবল মাত্র মুসলিমদের অন্যান্য দাবির কাছে নতি স্বীকার করে এই একক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এর প্রতিবাদে তিনি এজাভা হিন্দু সম্প্রদায়ের এস এন ডি পি প্রধান ভেলাপল্লী নাতেসনের সঙ্গে যৌথ আন্দোলনে নামার পরিকল্পনাকে হিন্দু ঐক্য সংস্থাপনের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ বলেই মনে করছেন। গভীর ক্ষোভ ব্যক্ত করে নায়ার বলেন, কেরলে আজ সামাজিক ন্যায়ের ধারণাটিই কবরস্থ হয়ে গেছে। যা কিছু উন্নয়ন তা কেবল মালাবারের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে উন্নয়ন আবার শুধুই ধনীদের আরও ধনী করার কৌশল। গরীব মুসলমানরাও উন্নয়নে উপেক্ষিত।

অপরদিকে আরও একটি বৃহৎ সম্প্রদায় ক্রিশ্চানরাও উন্নয়ন অক্ষের বাইরে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির পটভূমিতে কেরল এক বৃহত্তর হিন্দু অভ্যুত্থানের অপেক্ষায়। ☐

অন্য রকম

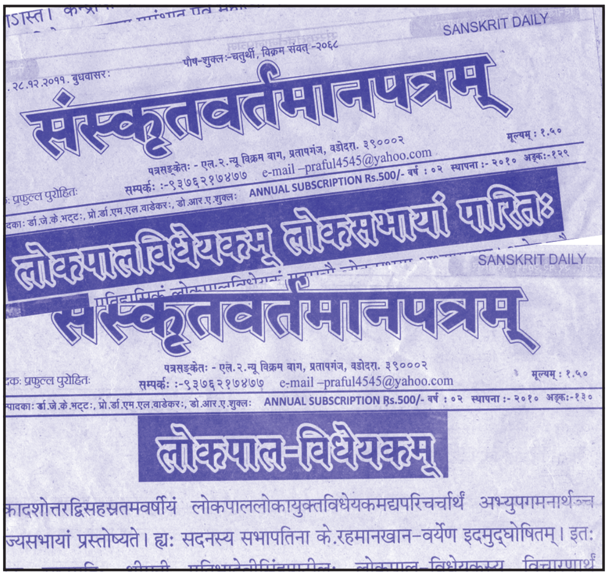
SANSKRIT DAILY
पौष-शुक्ल:-चतुर्थी, विक्रम संवत् -२०६८
२८.१२.२०११. बुधवासर:
संस्कृतवर्तमानपत्रम्
मूल्यम् : १.५०
पत्रसङ्केतः - एल.२.न्यू विक्रम बाग, प्रतापगंज, वडोदरा. ३९०००२
सम्पर्कः :-९३७६२१७४७७ e-mail –praful4545@yahoo.com
ANNUAL SUBSCRIPTION Rs.500/- वर्ष : ०२ स्थापना :- २०१० अङ्कः-१२९
प्रफुल्ल पुरोहितः
डॉ.जे.के.भट्टः, प्रो.डॉ.एम.एल.वाडेकरः, डो.आर.ए.शुक्लः
लोकपालविधेयकम् लोकसभायां पारितः
SANSKRIT DAILY
संस्कृतवर्तमानपत्रम्
पत्रसङ्केतः - एल.२.न्यू विक्रम बाग, प्रतापगंज, वडोदरा. ३९०००२
मूल्यम् : १.५०
प्रफुल्ल पुरोहितः
सम्पर्कः :-९३७६२१७४७७ e-mail –praful4545@yahoo.com
डॉ.जे.के.भट्टः, प्रो.डॉ.एम.एल.वाडेकरः, डो.आर.ए.शुक्लः ANNUAL SUBSCRIPTION Rs.500/- वर्ष : ०२ स्थापना :- २०१० अङ्कः-१३०
लोकपाल-विधेयकम्
...कादशोत्तरद्विसहस्रतमवर्षीयं लोकपाललोकायुक्तविधेयकमद्यपरिचर्चार्थं अभ्युपगमनार्थं...
...ज्यसभायां प्रस्तोष्यते। ह्यः सदनस्य सभापतिना के.रहमानखान-वर्येण इदमुद्घोषितम्। इतः

# সংস্কৃত দৈনিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** ভাষা এক ধরনের অভিব্যক্তি। কারণ ব্যক্ত করাই ভাষার কাজ। যা অব্যক্ত কিছু প্রকাশ করে না, তাকে ভাষা বলা যায় না। বলাই বাহুল্য ভাষা নিজেকে প্রকাশ করে না, কারণ সে হচ্ছে প্রকাশ মাধ্যম। সে বাহকমাত্র। মানুষের মনে অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা ও আবেগকে সে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। এক বা একাধিক মানুষের কাছে। কিন্তু সে তো আর ওয়ানওয়ে ট্রাফিক নয়। তার চলন দুমুখো। প্রয়োজনে সংলাপ— মনোলগ থেকে ডায়ালগ। কেননা তার কাজ কম্যুনিকেশন। যোগসূত্র রচনা। সংযোগ স্থাপন বা বিনিময়। লেখক আর পাঠক, শিল্পী আর দর্শক, গায়ক আর শ্রোতা— এইসব দুইয়ে দুইয়ে মিলেই জগত। কারণ একেলা গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে। কম্যুনিকেশনের বৃত্তটি তবেই হবে সম্পূর্ণ। জোট বাঁধাই যে কোনও সাহিত্য এবং শিল্পের প্রাথমিক শর্ত। এত কথা বলার উদ্দেশ্য সাহিত্যের মনস্ক বা সচেতন পাঠক হতে গেলে, রসাস্বাদন করতে চাইলে, ভাষার সম্যকজ্ঞান প্রয়োজন। নইলে নিছক সাক্ষরতা সম্বল নীরস গোলা পাঠক। গলাধঃকরণ করার ক্ষমতা থাকলেও তার স্বাদন ক্ষমতা নেই। জিভের সঙ্গে উদরের তুলনাই মনে পড়ে এই সূত্রে। আর এ জন্যই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন।

যাঁরা সংস্কৃতকে মৃতভাষা হিসেবে গণ্য করে তার ডেথ সার্টিফিকেট লিখে বসে রয়েছেন, আর যাঁরা সংস্কৃত ভাষা মনেই চাঁদ ফুল নিদেন পক্ষে প্রিয়ার মুখচন্দ্রিমার আলংকারিক বর্ণনা ছাড়া কিছু ভাবতে পারেন না— তাঁদের মনে হয় এবার রিটায়ারমেন্ট করার সময় হয়ে এসেছে। সংস্কৃত ভাষা মানেই যে দাঁত ভাঙা খটোমটো কিছু নয়, 'নরঃ নরৌ নরাঃ' মুখস্থ করা নয়, এ ভাষায় আধুনিক যুগের জটিল সবকিছু প্রকাশ করা সম্ভব তা পঁচিশ বছর ধরে দৈনিক সংস্কৃত পত্রিকা 'সুধর্মা' দেখিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে সংস্কৃতের বাজার যখন ডাউন ছিল তখনই সুধর্মা (৫৬১ রামচন্দ্র আগ্রাহাম রোড। মহীশূর ৪)-র গ্রাহক ছিল তিরিশ হাজার। যে বাঙালি কম্যুনিস্ট আঁতেলটি বলেছিলেন সংস্কৃত পুরোহিতের ভাষা, তাকে দুয়ো দিয়ে গত তিন বছর ধরে গুজরাট থেকে নিয়মিত সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে একটি দৈনিক পত্রিকা 'সংস্কৃত বর্তমান পত্রম্' (এল ২ ন্যু বিক্রম বাগ। প্রতাপগঞ্জ। ভাডোদরা-৩১০০০২)।

সংস্কৃত ভাষার এই দৈনিক পত্রিকাটিতে লোকপাল বিল, মমতার প্রণব বিরোধিতা, প্রকাশ কারাত ও প্রসেনজিৎ বিবাদ সব খবরই ছাপা হচ্ছে। তবুও কিছু কিছু রাজ্যে সংস্কৃত দুয়োরাণী হয়ে রয়েছে।

আমাদের রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হলেও সংস্কৃত নিয়ে সরকারের নীতির বদল ঘটেনি। ▯

---

## "সেদিন আমরা একত্র হইনি—আজও নয়"

**কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।**

*[ কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' প্রবন্ধ—মাঘ ১৩৩৩ ]*

**সৌজন্য : আশিস কুমার মঙ্গল**

**৩৩, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৬**

# সিউড়িতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি উন্মোচন

দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর বীরভূম শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতির উদ্যোগে সিউড়ির এস পি মোড়ে ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদের পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তি উদ্‌ঘাটন সমারোহ অনুষ্ঠিত হলো। সিউড়ি পৌরসভার পৌরপিতা উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, উপ-পৌরপিতা উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহযোগিতায় মূর্তি স্থাপিত হলো।

গত ৮ জুলাই বিকেলে মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র (জ্যেষ্ঠপুত্র অনুতোষের জ্যেষ্ঠপুত্র) শুভপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সংস্কার ভারতী'র সিউড়ি শাখা দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন।

অতিথিদের ভাষণে অমিতাভ ঘোষ, অধ্যাপক অসীম ঘোষ, ডঃ দেবব্রত চৌধুরী, সুভাষ নাগ, মিহির সাহা শ্যামাপ্রসাদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী শুভানন্দ,পশ্চিম রামচন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাপতির ভাষণে আবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মহম্মদ আব্দুল হাফিজ শ্যামাপ্রসাদের জীবন, হিন্দুত্ব ও বর্তমান মুসলমানদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভুল পথে চালানোর প্রচেষ্টা, সংখ্যালঘুপ্রীতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো বহু সংখ্যায় যুবক, জ্ঞানীগুণী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের পুরো সময়ের উপস্থিতি।

# হাওড়ার তাজপুরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের জন্মোৎসব

গত ৬ জুলাই হাওড়া জেলার তাজপুর শ্যামাপ্রসাদ ইন্সটিটিউট অব্ কালচারের উদ্যোগে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১১২তম জন্মজয়ন্তী ও বর্ষব্যাপী বিবেকানন্দ সার্ধশত জন্মজয়ন্তীর জুলাই মাসের কার্যক্রম পালিত হলো। ইন্সটিটিউটের প্রসাদতীর্থ সভাগৃহের জনাকীর্ণ সমাবেশে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্বামী বিবেকানন্দ ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মমর মূর্তি'তে মাল্যার্পণ এবং বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানের এই পর্বে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। সকাল ১০ টায় আয়োজিত হয় ২৮তম বার্ষিক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। দীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শিবির উদ্বোধন করেন উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি পৃথ্বীশ কুমার সামন্ত। ২৭ জন মহিলাসহ ১০০ জন রক্তদান করেন। রক্তদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন ভরুকা ব্লাড ব্যাঙ্কের পরিচালিকা ডাঃ শান্তা ঘটক, ফটিক চক্রবর্তী (অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট), তারকেশ্বর মিশ্র (অবসরপ্রাপ্ত সহ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।

বিকেলে 'আমার ভারত-অমর ভারত' শীর্ষক আলোচনায় বিবেকানন্দ ভাবনার বিস্তারিত আলোচনা করেন কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্রের বিশিষ্ট সদস্য অরবিন্দ দাস। এই পর্বে উপস্থিত থেকেছেন এলাকার বিধায়ক অসিত মিত্র ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুমন সরকার।

শেষে প্রসাদস্মৃতি সরস্বতী শিশুমন্দির ছাত্র ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, নৃত্য, গীত ও গীতি আলেখ্য ও শহীদ ক্ষুদিরামের নাটক পরিবেশিত হয়।

## সমাবেশ সমাচার

### মালদায় শিশু স্বাস্থ্য শিবির

মালদা শহরের এন এস রোডের অন্তর্গত সরস্বতী শিশু মন্দিরের উদ্যোগে ও ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের (আই এম এ) সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে পাঠরত প্রায় ৩৫০ জন শিশু ভাই-বোনদের এক মহতী স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়ে গেল। এই স্বাস্থ্য শিবিরে মালাদা জেলার বিভিন্ন বিভাগ যথা চোখ, দাঁত, নাক-কান গলা (ই এন টি), চর্ম প্রভৃতির স্বনামধন্য চিকিৎসকরা ছাড়াও জেলার কয়েকজন শিশু বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থেকে শিশু ভাই-বোনদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও পরামর্শ দেন। জেলার ডেপুটি সি এম ও এইচ ডাঃ প্রধান এবং আই এম এ-এর মালদা জেলা সভাপতি ডাঃ তাপস চক্রবর্তী ও সম্পাদক ডাঃ বৃন্দাবন রায়প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থেকে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। মালদা শহরের সরস্বতী শিশু মন্দিরের এই উদ্যোগ অভিভাবক ও অভিভাবিকা মহলে বেশ সাড়া ফেলে।

### মঙ্গলনিধি

মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর খণ্ডের বৌদ্ধিক প্রমুখ কিশোর সরকারের শুভ বিবাহ উপলক্ষে ২৯ জুন নব-দম্পতি সহ পিতামাতা, সপরিবার দুই হাজার এক টাকা মালদা জেলা প্রচার প্রমুখ রাজু কর্মকার ও জেলা প্রচারক মলয় দত্ত-এর হাতে মঙ্গলনিধি তুলে দেন।

### পরলোকে উত্তম সরকার

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলার (তারকেশ্বর) আরামবাগ মহকুমার প্রাক্তন সেবা প্রমুখ, ভুঁয়েড়া শাখার স্বয়ংসেবক উত্তম সরকার গত ১২ জুলাই পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫২ বৎসর। দীর্ঘদিন শ্বাস কষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত সঙ্ঘের আদর্শের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা অটুট ছিল। সঙ্ঘময় পরিবার। স্বল্প আয়ুস্কালেও তিনি আরামবাগ মহকুমার বালিবেলা শাখায় বিস্তারক, চুঁচুড়া মহকুমার পাকড়ি গ্রামে বিস্তারক ও হাওড়া জেলায় উলুবেড়িয়া মহকুমায় প্রচারক হিসাবে সঙ্ঘের কাজ করেছেন। স্ত্রী, দুইপুত্র, দাদা ও ভাইকে রেখে গেছেন। বর্তমানে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বৈভব সরকার, পুড়শুড়া খণ্ডের বৌদ্ধিক প্রমুখ এবং বিদ্যার্থী হিসাবে তারকেশ্বর জেলার কার্যালয়ে থাকে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

# আচার্য ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

## এক মহাজীবন কথা

গোপাল চক্রবর্তী

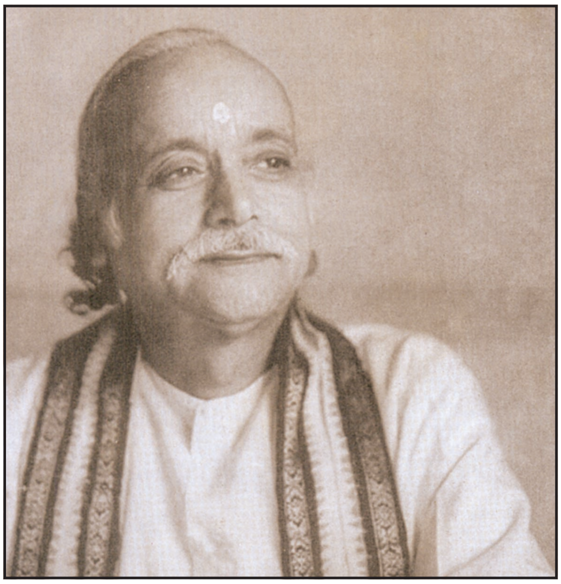

“...অধ্যাপনা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকরূপে গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি রচনা করেছেন বহু গ্রন্থ।... ...ব্যবহারিক জীবনে তিনি ছিলেন শিশুর মতো সরল, কিন্তু আত্মমর্যাদার প্রশ্নে আপোষহীন। ছাত্রছাত্রীরা ছিল তাঁর সন্তানতুল্য। শুধু শিক্ষা নয়, পারিবারিক সমস্যাতেও তিনি সব সময় তাদের পাশে থেকেছেন।”

চলে গেলেন মহামহোপাধ্যায় আচার্য ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। ২০০৪ সালে বরানগর পাঠবাড়ি যাবার পথে এক আকস্মিক পথ দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন। অনেক চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হলেও একটা পা চিরতরে বিকল হয়ে যায়। দীর্ঘ ন’ বছর প্রায় শয্যাশায়ী হলেও তাঁর লেখনী কখনও স্তব্ধ হয়নি। গত কয়েকদিন আগে ইনফ্লুয়েঞ্জা, পেটে জল জমা এবং মূত্রাশয়ে সংক্রমণের জন্য কলকাতার এক নামী নার্সিংহোমে ভর্তি হতে হয়। নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেলেও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেননি। ১৭ জুলাই মঙ্গলবার দুপুরে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

ধ্যানেশনারায়ণের জন্ম হয়েছিল অবিভক্ত বাংলার চট্টগ্রাম জেলার খিতাপচর গ্রামের এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারে। পিতামহ কৃতিরত্ন কৃষ্ণকান্ত চক্রবর্তী ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী এবং দানশীল। পিতা কবিশেখর বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ ছিলেন সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। তাঁর দশ সন্তানের মধ্যে ধ্যানেশ নারায়ণ তৃতীয় এবং পুত্র হিসাবে জ্যেষ্ঠ। চট্টগ্রাম জেলার হিন্দু প্রধান এই অঞ্চল ছিল শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান।

স্বগৃহে তাঁর প্রথম পাঠ শুরু হলেও গ্রামের মাইনর স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল। সৌম্যদর্শন, মেধাবী এবং মিষ্ট স্বভাব, এই ছাত্রটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর অতি প্রিয় ছিলেন। বরিশাল জেলার ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৭ সাল, হলো দেশভাগ। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জীবনে এক চরম অভিশাপ। নিজের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে, সাজানো সংসার ফেলে রেখে, ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরি-বাকরির মায়া ত্যাগ করে এক কাপড়ে বেরিয়ে আসার পালা। পিতা বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ পশ্চিমবঙ্গের হুগলী সরকারি বিদ্যালয়ে কাজে যোগদান করেন। সেখানে সপরিবারে তিনি চলে আসেন এবং ধ্যানেশনারায়ণ চন্দননগর সরকারি কলেজ থেকে আই এ পরীক্ষায় এবং পরে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে অর্নাস-সহ বি-পাশ করেন। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্য ও অলংকার মুখ্য বিষয় রেখে কৃতিত্বের সঙ্গে এম এ পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় তিনি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী-র মতো মনীষী অধ্যাপকদের সান্নিধ্যে আসেন। এঁদের অনেকের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

কর্মজীবনে তিনি ব্যারাকপুরের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, উত্তরপাড়ার রাজা পিয়ারীমোহন কলেজ, নারকেলডাঙ্গার স্যার গুরুদাস কলেজে কিছুদিন করে অধ্যাপনার পর গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। ছাত্রজীবন থেকে সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতের সঙ্গে তিনি

যুক্ত হয়েছিলেন। গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজে অধ্যাপনার সময় তাঁর আরও ব্যাপ্তি ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আহ্বানে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি পি এইচ ডি ডিগ্রীলাভ করেন। পশিমচমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে তিনি পেয়েছেন অসংখ্য সম্মান, উপাধি। দত্তপুকুরে বসতবাড়ি 'ঋষিধাম'-এ তাঁর অবস্থান সেই অঞ্চলকে গৌরবান্বিত করেছে। কৃতী অধ্যাপকরূপে ভারত সরকার তাঁকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত করে। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এবং তাঁর সহধর্মিণী পরবর্তীকালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী তাঁদের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'প্রাচ্যবাণী মন্দির' নামে একটি সংস্কৃত প্রচারের কেন্দ্র। কলকাতার রাজভবন, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন মঞ্চে বহু সংস্কৃত নাটকে তিনি নিয়মিত অভিনয় করেন। উজ্জয়িনীর কালিদাস সমারোহে ১২ বছর তিনি যোগদান করেছেন। যার নেতৃত্বে ছিলেন আচার্য ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী। অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিসাবে বেশ কয়েকবার স্বর্ণকলসও লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' ও 'মুক্তধারা' নাটক দুটি তিনি সংস্কৃতে সার্থক অনুবাদ করেন। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ 'ডাকঘরে'র সংস্কৃত অনুবাদ 'বার্তাগৃহম্'-এর ভূমিকা লিখেছিলেন। শুধু সংস্কৃত নাটক নয়, বাংলা এবং ইংরাজী নাটকেও তার অবাধ বিচরণ ছিল। বিশ্ব বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপীয়ারের জন্মের চারশত বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রভারতীতে 'ওথেলো' নাটক মঞ্চস্থ হয়। 'ইয়াগো' চরিত্রে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী।

ঠাকুর শ্রীশ্রী ওঙ্কারনাথ দেবের মন্ত্রশিষ্য হিন্দুত্ব ও সংস্কৃত রক্ষার জন্য নিবেদিত প্রাণ আচার্য ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাদেশিক সভাপতি। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় যে নাগরিক সমিতি গঠিত হয়েছিল, তরুণ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর সহ সম্পাদক। রবীন্দ্রচর্চা ভবনের দীর্ঘ সময়ের সম্পাদক ছিলেন তিনি। সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কার্যকরী সভাপতি। এছাড়াও অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। আকাশবাণীর সংস্কৃত ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃত শিক্ষার আসরের প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনি। সংস্কৃতে বহু নাটক তিনি প্রযোজনা এবং অভিনয় করেছেন। 'মুক্তধারা' এবং 'বার্তাগৃহম্' তার মধ্যে অন্যতম। আকাশবাণীর বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মতো গুণীজনদের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। সাধারণ কলাকুশলীরা পর্যন্ত ছিল তাঁর গুণগ্রাহী। দূরদর্শনে মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে অনেক জনপ্রিয় অনুষ্ঠানও তাঁর পরিচালনায় এবং অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয়েছে।

অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন তিনি। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী এমনকি হিন্দিতেও অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। মানুষকে আকর্ষণ করার এক অনন্য সাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। অতি বড় বিরুদ্ধবাদীও তাঁর কাছে এসে মাথা নত করত।

শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন অসাধারণ জনপ্রিয়। ক্লাসে তার বক্তৃতা শোনার জন্য অন্য ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা এসে ভিড় করতো। যে কোনও বিষয়ে তাৎক্ষণিক সংস্কৃত শ্লোক রচনা তাঁর আর এক বিশেষ কৃতিত্ব। তাঁর অধীনে প্রায় ৭০ জন গবেষক কৃতিত্বের সঙ্গে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রিলাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঋষিধামে অবস্থান করে গবেষণার কাজ সম্পন্ন করেছেন। সংস্কৃত ও হিন্দুত্ব রক্ষার সংগ্রামে তিনি দু'বার কারাগারে গেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, জেলের কর্তা থেকে কয়েদী সবাই তাঁর কাছে অবনত মস্তক। তিনি যেন তাদের আরাধ্য দেবতা।

অধ্যাপক এবং বক্তা হিসাবে ওপার বাংলায় তিনি এক কিংবদন্তী। ওপারের সারস্বত সমাজের কাছে তিনি এক দেবতুল্য মানুষ। আচার্যপত্নী প্রয়াতা ঊষাদেবী ছিলেন প্রকৃত অর্থে সকলের মা। তাঁর স্নেহ তুলনাহীন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি বিমুখ হলে ১৯৮৭ সালে তিনি বিখ্যাত স্থপতি গোপাল মিত্রের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করেন 'শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদ'। অগ্রজ-প্রতিম প্রয়াত আচার্য রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশ এবং তত্ত্বাবধানে
ডঃ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়, ডঃ সুরেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় সংস্কৃত চর্চার এক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। অধ্যাপনা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকরূপে গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি রচনা করেছেন বহু গ্রন্থ। যেমন— ভারতীয় 'সংস্কৃতির উত্তরাধিকার', 'কৃষ্টির দৃষ্টিতে', 'জনশিক্ষায় সংস্কৃত' 'যুগ সংকটে ভারত', 'অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক' হিন্দু প্রভৃতি। এছাড়া অনেক গ্রন্থের সম্পাদনাও করেছেন। যেমন— বাল্মীকি রামায়ণ, গীতা রহস্য, হিন্দু শাস্ত্র, মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী প্রভৃতি। এছাড়া দেশ বিদেশের বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকায় অসংখ্য
প্রবন্ধ এবং কবিতা রচনাও তিনি করেছেন। তাঁর একমাত্র সুযোগ্য সন্তান ডঃ নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী বর্তমানে দিল্লীর ভারতীয় দর্শন চর্চা পর্ষদের মেম্বার সেক্রেটারি। বধূমাতা মধুছন্দা চক্রবর্তী রবীন্দ্রভারতীর দর্শনের অধ্যাপিকা।

ব্যবহারিক জীবনে তিনি ছিলেন শিশুর মতো সরল, কিন্তু আত্মমর্যাদার প্রশ্নে আপোষহীন। ছাত্রছাত্রীরা ছিল তাঁর সন্তানতুল্য। শুধু শিক্ষা নয়, পারিবারিক সমস্যাতেও তিনি সব সময় তাদের পাশে থেকেছেন। এহেন শিক্ষাগুরুর প্রয়াণে শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। ▯

খেলার জগৎ

# ইতিহাসের আলোকে প্রাচীন অলিম্পিক

**জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

১৯৬০ সালে রোমে আধুনিক অলিম্পিকের চতুর্দশ মহোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইতালির রাষ্ট্রপতি গিয়োভানি গ্রসি অলিম্পিক সংগঠকদের উদ্দেশে রচিত এক বাণীতে বলেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মানব মানবীরা প্রজ্জ্বলিত পূতাগ্নিকে সাক্ষী রেখে শুধু যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবেন তাই নয়, আগামীদিনের জন্য এক সমৃদ্ধ পৃথিবী সৃষ্টি করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার হবে এই সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের শক্তির কেন্দ্রস্থল ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইউরোপের অন্যতম আধুনিক রাষ্ট্র ইতালির রাজধানী রোম থেকে উচ্চারিত ওই বাণী মানুষকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তার পরিমাপ করা যায়নি। পরবর্তীকালে অলিম্পিকের ক্রমবর্ধমান আবেদন ও জনপ্রিয়তায় বোঝা গেছে, প্রথমে গ্রিস, পরে পোলুপনেশিয়াস, হেলেনিক, ন্যস হেলেনিক এবং শেষ পর্যন্ত রোমান সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়েছে। প্রতি চারবছর অন্তর এক একটি অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য সম্পর্কে নতুন নতুন চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে সভ্যতা বলে যে অর্থ আমাদের আধুনিক মনে গাঁথা হয়ে গেছে তারও গোড়াপত্তন করছে।

ইতিহাসের যাঁরা ছাত্র তাঁরা জানেন, গ্রিস দেশের এলিস জনপদের রাজা ইফিটাস এই ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করেছিলেন আজ থেকে প্রায় তিনি হাজার বছর আগে। আরও আশ্চর্যের কথা ওই ক্রীড়া উৎসবের প্রতি চার বছর একাধিক্রমে ২২ বার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রোমান সম্রাট থিও ভেসিয়াস ৩৯৩ খৃস্টাব্দে এক বিশেষ ডিক্রির মাধ্যমে অলিম্পিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন। দেবদেবীতে বিশ্বাসী ও ধর্মাচারণে অভিনিবিষ্ট গ্রিসের মানুষের কাছে একদিন ক্রোলেস পাহাড়ের ঢাল থেকে নেমে আসা এলফিউস নদীর তীরে অবস্থিত উপত্যকা এক পরম তীর্থস্থান ছিল। ওই উপত্যকাকে গ্রামবাসী শান্তি ও শ্রদ্ধাপ্রকাশের উপত্যকা বলে বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস করতেন স্বর্গ থেকে দেবদেবীরা ওই উপত্যকায় অবতীর্ণ হন। পুরোহিতরা এখানে এসে রাষ্ট্রনায়কের উদ্দেশে উচ্চারিত দৈববাণীর আদেশ গ্রহণ করতেন। রাজা ইফিটাসকে যেমন অলিম্পিকের সূচনাকারী বলা হয় তেমনি দেবাদিদেব জিউসের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, প্রাচীন অলিম্পিকের যাবতীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অভিযান গ্রিসবাসীর কাছে পবিত্র ধর্মাচরণের মতোই ছিল। অলিম্পিকের সূচনা ও প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার ইতিহাস ও তার নান্দীমুখ নিয়ে অবশ্য নানাপ্রকার মতামতও পাওয়া যায়। আধুনিক মানুষও লোকগাথা, কিংবদন্তীর সংমিশ্রণে প্রচলিত যাবতীয় সব ঘটনাবলি সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। প্রাচীন অলিম্পিকের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার রেকর্ড রাখা হোত কিনা জানা যায় না। কিন্তু প্রাচীন অলিম্পিকের কেন্দ্রস্থল অলিম্পিয়া একদিন যে শিল্প ও ভাস্কর্যের অনুপম প্রান্তর ও কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, তার অজস্র প্রমাণ আধুনিক মানুষের কাছে বিস্ময়কর রূপে উপস্থিত হয়েছে। প্রাচীন ইতিহাস স্বীকার করে নিয়েছে গ্রিসের বিভিন্ন নগররাষ্ট্র থেকে তরুণরা প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিয়ায় সমবেত হতেন এক পূর্ণিমার তিথিতে। অলিম্পিয়ায় যাবার ঘোড়ায় টানা রথের দৌড়, লম্ফন, বক্সিং সহ নাটক সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন ইভেন্টের জন্য প্রস্তুত হতেন। নগরে বিভিন্ন জনপদে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা মূল অলিম্পিকের অংশগ্রহণের সুযোগ পেতেন। অনেকটা এখনকার প্রি-অলিম্পিকের মতো। অলিম্পিকের বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হোত অলিভ গাছের পাতার তৈরি মুকুট পরিয়ে দিয়ে।

কথিত আছে যে করারিয়াস ইতিহাসের প্রথম অলিম্পিক পুরস্কার প্রাপক। সেদিনের অলিম্পিক প্রতিযোগী মাত্রেই অলিম্পিয়ার প্রবেশ করতেন এক শোভাযাত্রা পুরোভাগ থেকে। তাকে অনুসরণ করতেন নগরবাসীরা।

প্রতিযোগীদের অঙ্গে সিঁদুর রঙের বস্ত্রের আচ্ছাদন, রথ টেনে নিয়ে চলেছে সাদা রঙের জোড়া ঘোড়া। অলিম্পিয়ায় পৌঁছে প্রতিযোগীরা অনুষ্ঠানের আগে সমবেত হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, বুকটা ঈষৎ এগিয়ে, শরীরের সঙ্গে লাগানো হাতের কনুই দুটো একটু পিছিয়ে দিতেন, মুষ্টিবদ্ধ থাকতো হাত। □

# সক্রেটিস ও প্লেটোর মতো দার্শনিকরাও অলিম্পিক দেখতে আসতেন

**জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

খৃস্টীয় প্রথম শতকে রোম সাম্রাজ্যের তিনজন সম্রাট অলিম্পিকের রথের দৌড়ে যোগদান করেছিলেন বিজয়ীর মুকুটের লোভে। তাঁরা হলেন টাইবেরিয়াস,

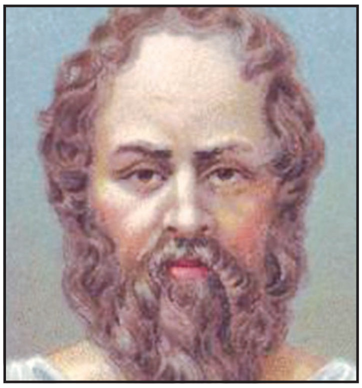

*সক্রেটিস*

জার্মেনিকাস এবং দুর্ধর্ষ দোর্দন্ডপ্রতাপ নিরো। মৃত্যুভয়শূন্য নিরো প্রচণ্ড বেগে রথ চালাতে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েছিলেন। এর কিছুদিন পরেই রাজসিংহাসন থেকেও পতন হয় নিরোর। নিরোর পতনের মাধ্যমে অতুল গৌরবে গরিমামণ্ডিত রোমের সাম্রাজ্যের ও সভ্যতারও অবক্ষয় শুরু হয়। যদিও তারপর আরও তিনশো বছর ধরে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছে রোমান সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়ে। তারপর একদিন গ্রেকো রোমান সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। অলিম্পিয়াও লুপ্ত হয়ে গেল। রোমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার আভিজাত্য ও ঐতিহ্যের প্রতীক অ্যাম্ফিথিয়েটার, কলোসিয়াম, স্টেডিয়াম সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। দীর্ঘ বারো শতাব্দীর পর ইউরোপে নবজাগরণের মাধ্যমে প্রাচীন অলিম্পিয়ার গৌরবগাঁথা ও অলিম্পিকের বিস্ময়কর সব ঘটনা ও সৃষ্টিকল্প উদ্‌ঘাটিত হয়। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিরন্তর গবেষণা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাটির তলা থেকে উঠে এল মানব সভ্যতা তথা প্রগতির ইতিহাসের বিস্ময়কর সব অধ্যায়। মার্বেল পাথরের তৈরি অলিম্পিয়া নগরী, ব্রোঞ্জ এবং মার্বেল নির্মিত ক্রীড়াবিদ ও শিল্পীদের অনবদ্যমূর্তি, স্মারক স্তম্ভ, মন্দির, স্মৃতি সৌধ প্রভৃতি। যা আধুনিক

*প্লেটো*

পৃথিবীর মানুষের কল্পনারও অতীত। অলিম্পিয়া খুঁজে পাওয়ার ঠিক একশো বছর পরে মহান ফরাসী দার্শনিক সমাজ সংস্কারক ঐতিহাসিক ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তিন আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা করলেন ১৮৯৬ সালের ৬ এপ্রিল। গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে রচিত হলো অলিম্পিয়াডের প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার পূর্ণবৃত্ত। সেই ইতিহাস আধুনিক সভ্যতার চূড়ান্ত জয়যাত্রার ইতিহাস।

কিন্তু যে ইতিহাস একদিন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তা উৎখননের ফলে উদ্‌ঘাটিত হলো নতুন নতুন বিস্ময় নিয়ে। প্রাচীন গ্রীসের চারণ কবি পিন্ডারের সৃষ্টি সব লোকগাঁথার মধ্যে পাওয়া যায় সে যুগের খেলা ও শরীরটাকে নিয়ে অনবদ্য সব সৃজনী। তার অঙ্কিত ব্যাসিলাইডিসের চিত্রকলার মধ্যে প্রতিফলিত বিজয়ী অ্যাথলিটদের বীরত্বব্যঞ্জনালব্ধ রূপ। গ্রীসের সমস্ত ভাস্কর্য গড়ে উঠেছে সে সব প্রখ্যাত বিজয়ীদের কেন্দ্র করে। মাইরন, ফিডিয়াস, পলিক্লেটাসের সৃষ্ট সব ভাস্কর্যের মধ্যে দিয়ে আমরা সেই চিরন্তন বিজয়ী মানুষটিকেই খুঁজে পাই। সেই ব্যায়ামবীরের অথবা ডিসকাস ছোঁড়ার ভঙ্গির আজও কি কোনও পরিবর্তন হয়েছে?

রোমান সাম্রাজ্য একদিন যেমন গ্রীক সাম্রাজ্যকে গ্রাস করেছিল, সেভাবে রোমান সভ্যতা খেলাধূলা নিয়ে মানুষের চিন্তার দিগন্তও বিস্তার করেছে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির জন্য সৃষ্টি বিশাল সব স্টেডিয়াম, অ্যাম্ফিসিয়েটোরের গঠনশৈলী বিশ্বের বিস্ময়। ভাবীকালের শিল্প ও প্রযুক্তির উত্তরোত্তর উন্নতির স্টেপিংস্টোন রোমের স্নানাগার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আজকের আধুনিক সুইমিং পুল। ভূমধ্যসাগরের তীরে সারি সারি প্রাসাদ আজও আমাদের চিন্তা ও কল্পনাকে বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখে। রোমের সার্কাস ম্যাক্সিমাস স্টেডিয়ামের যে বর্ণনা ও ছবি পাওয়া যায় তা আধুনিক মানুষের সব কল্পনাকে পর্যন্ত হার মানাতে পারে। বলা হয়েছে প্রায় চারলাখ মানুষ বসতে পারেন এমনভাবেই নির্মিত হয়েছিল সার্কাস ম্যাক্সিমাস। প্রায় ছোটখাটো একটি শহরের আকারে তৈরি এই স্টেডিয়াম রোমের কেন্দ্রস্থলে ছিল। বিরাট ওই স্টেডিয়ামে এক সঙ্গে একশোটি রথের রেস হোত। তাছাড়া আরও নানাবিধ প্রতিযোগিতা। যা উপভোগ করতেন রোমের রাজপুরুষ, অভিজাতবর্গসহ সাধারণ মানুষ। সে যুগের বিভিন্ন খেলা ও শারীরিক বৌদ্ধিক নানা কলাকৌশল নিয়ে অঙ্কিত সব চিত্রকলা যা স্বযত্নে রক্ষিত রোমের অ্যাম্ফিথিয়েটার বা গ্রিসের অ্যাক্রোপলিস কিংবা এথেন্সের দেওয়ালে, আজকের শিল্প তাত্ত্বিক ও গবেষক ঐতিহাসিকদের কাছে তা পরপর চিন্তার তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে। টারকুইলিয়ান চিত্ররীতি ও শৈলীর এই সব অমর চিত্রভাস্কর্য থেকেই উদ্ভাসিত হয়েছিল মধ্যযুগে ইতালির শিল্প আন্দোলন বা রেঁনেশাস। মল্লবীর, প্যানক্রেশিয়ান যোদ্ধা, ডিসকাস নিক্ষেপ, দৌড়, রথের রেস, নাটক, সঙ্গীতের প্রতিযোগীদের অপূর্ব দেহসুষমা মণ্ডিত বিভিন্ন আঙ্গিকের সক্রিয় ভঙ্গিমা থেকেই বোঝা যায় প্রাচীন অলিম্পিকের সভ্যতা ও ইতিহাস কত সমৃদ্ধ ছিল।

**শব্দরূপ-৬৩৫** ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ■ | ৩ | | | |
| | ■ | ৪ | | | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ৫ | | ■ | ৬ | | ৭ | |
| ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| ৮ | | | ৯ | ■ | ১০ | | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ১১ | | | ■ | ১২ |
| ১৩ | | | | ■ | ১৪ | | |

## সূত্র :

**পাশাপাশি :** ১. গৌরী, পার্বতী, ৩. চতুরঙ্গিনী সেনার সংখ্যাভেদ, ৪. বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার, ৫. হৈমন্তিক ধান্য, ৬. ঘেঁটু, ঘেঁটুঠাকুর, ৮. অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহার্থে সম্প্রদান ১০. বিরাট গৃহে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম, ১১. "যেমন কুকুর, তেমন—" ১৩. আষাঢ় মাসে মিথুন রাশির সূর্য যখন আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদ ভোগ করে (প্রবাদ— পৃথিবী তখন রজঃস্বলা) ১৪. "ভাঁড়ে মা—"

**উপর-নীচ :** ১. স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ, ২. মহর্ষি গৌতমের শিষ্য, জবালার পুত্র, ৩. নিষ্পাপ, দুঃখহীন, ৫. দুর্গার একটি নাম, ৭. চড়ুই পাখি, ৯. কন্দর্প, মদন, ১০. হস্তিশাবক, ১২. নদী।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৩২
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
নিশীথ দে
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ক | পি | ল | ■ | ল | ■ | ■ |
| ■ | ■ | না | ■ | ■ | হ | র্ষ | শ্ব |
| অ | ■ | কে | লে | সো | না | ■ | শু |
| ম | হে | শ | ■ | ম | ■ | ■ | র |
| রা | ■ | ■ | ই | ■ | অ | মো | ঘ |
| ব | ■ | কে | তু | মা | ন | ■ | র |
| তী | ব | র | ■ | ■ | সু | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ল | ■ | প্র | য়া | গ | ■ |

*শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।*

▯ ৬৩৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ২০ আগস্ট, ২০১২ সংখ্যায়


## ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে "চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী।

*উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।*

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

"ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

**B.H.M.S. (Cal.),F.W.T., P.E.T."**

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা—
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

# ।। চিত্রকথা ।। মহাভারত ।। ৬

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

# অসম জুড়ে সংগঠনের জাল ছড়াচ্ছে মাওবাদীরা

**সংবাদদাতা**॥ সিপিআই (মাওবাদী)-এর কমপক্ষে ২০০ ক্যাডার অসম জুড়ে তাদের সংগঠনের জাল বিস্তারে সক্রিয়। ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম (উলফা)-এর ক্যাডারদের সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা তারা পাচ্ছে বলে খবর। অসম পুলিশ প্রধান (DGP) জে এন চৌধুরী বলেছেন, মাওবাদীরা তাদের কাজকর্ম বিস্তারের জন্য উলফার লিঙ্কম্যানদের সাহায্য নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, মাওবাদীরা অন্য সব সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সহযোগিতা নিতেও কোনও কার্পণ্য করছে না। যেসব এলাকায় একসময় উলফার ঘাঁটি ছিল সেসব এলাকাতে মাওবাদী গতিবিধি বাড়ছে। উজান (আপার) অসমে মাওবাদীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে আদিত্য বরা। গ্রামীণ এলাকার সাধারণ পশ্চাৎপদ মানুষদেরকেই মাওবাদীরা টার্গেট করেছে বলে ডি জি পি শ্রী চৌধুরী জানিয়েছেন। তিনি এক পত্রিকাকে প্রশ্নের উত্তরে আরও জানিয়েছেন, 'মাওবাদীরা দেশের সর্বত্র গ্রামীণ জনতাকে লক্ষ্য করে তাদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছে। অনুন্নত এলাকার সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিচ্ছে।'

পুলিশ প্রধানের কথায় গুয়াহাটি শহরে মাওবাদীদের একটি সেল কাজ করছে। তারা অন্য প্রদেশ থেকে আসা শীর্ষ মাও-নেতাদের দেখভাল, যাতায়াত ও ট্রানজিটের ব্যবস্থা করে।

*পুলিশের হাতে ধৃত জনৈক মাওবাদী (ফাইলচিত্র)*

একথা জানিয়েছেন মাও ক্যাডার চন্দন বর্মন, যাকে সম্প্রতি গুয়াহাটি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অসমে মাওবাদী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে টাস্ক ফোর্স গড়া হচ্ছে। ওই টাস্ক ফোর্সে অভিজ্ঞ বরিষ্ঠ পুলিশ অফিসাররা থাকবেন। মাওবাদী হিংসা প্রভাবিত রাজ্য ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় এবং অন্ধ্রপ্রদেশ সফর করে সেখানে কিভাবে মাওবাদীদের মোকাবিলা করা হচ্ছে সে বিষয়ে এই টাস্ক ফোর্স অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। মাওবাদীরা দেশের কোন্ কোন্ সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সাহায্য নিচ্ছে তাও খতিয়ে দেখবে টাস্ক ফোর্স। অসম পুলিশ প্রধান জে এন চৌধুরী আরও জানিয়েছেন, এন এস সি এন (আই-এম)-এর প্রাক্তন জঙ্গি ক্যাডারেরা এবং মণিপুরভিত্তিক কিছু জঙ্গি একশ্রেণীর মাও-ক্যাডারদের অসমে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। গোদাপানি পাঠক হত্যাকাণ্ডে কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কে এল ও) জড়িত বলে শ্রী চৌধুরী জানিয়েছেন। মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যেই কামতাপুরী লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা কে এল ও পাঠককে অপহরণ করেছিল। কেননা মায়ানমারে কে এল ও ক্যাডারদের প্রশিক্ষণের জন্য তাদের অনেক টাকার প্রয়োজন। সব মিলিয়ে অসমে মাওবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে অসম পুলিশ বেশ চিন্তিত।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
30 July - 2012

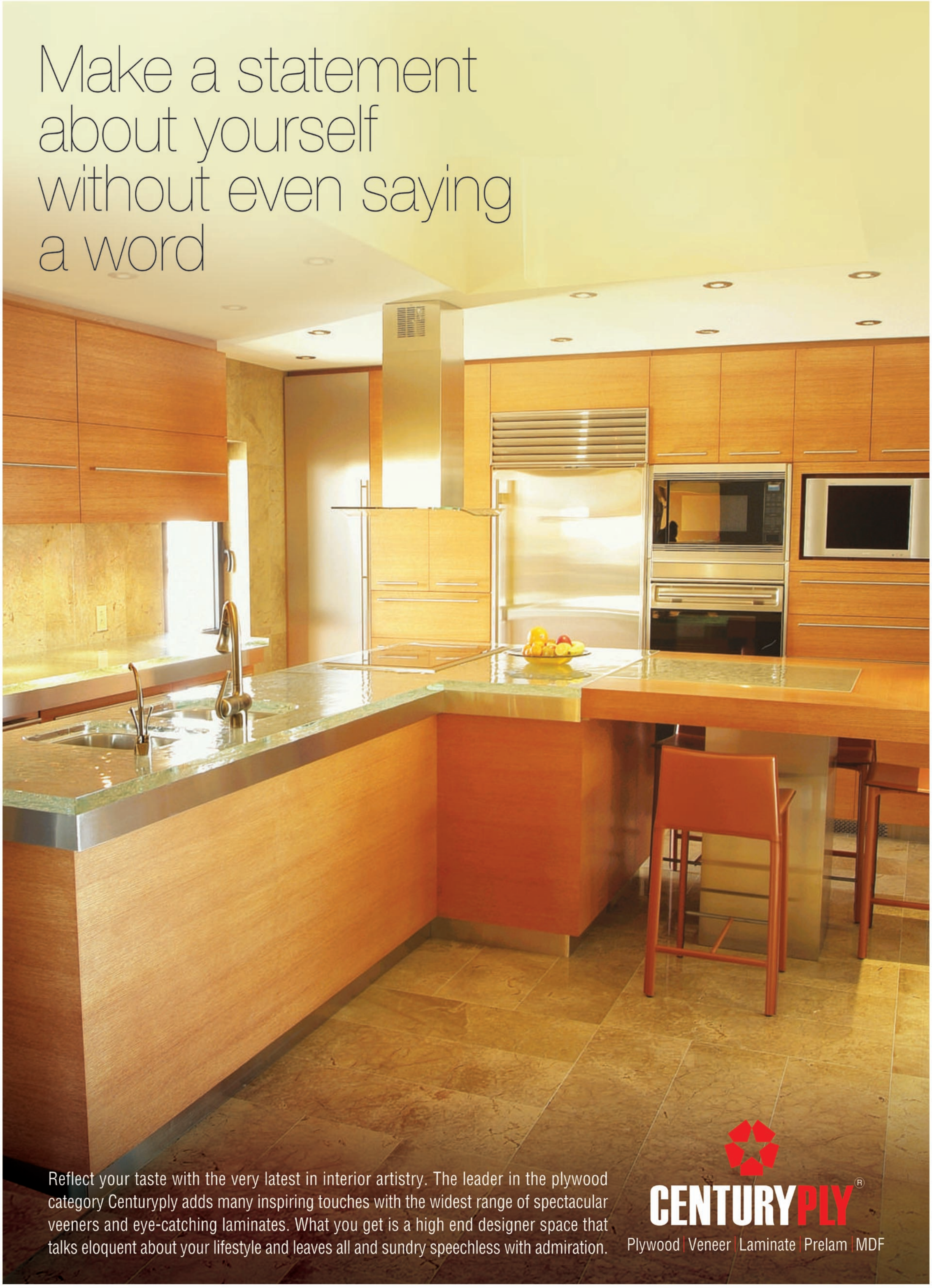


দাম : ৭.০০ টাকা